মানুষ মানুষীর গল্প



মনন দাস

মানুষ মানুষীর গল্প

মনন দাস

সৌরভ
গ্রন্থ প্রকাশ
বালী হাওড়া

Manush Manushir galpo
A collection of short stories by
Manan Das

প্রকাশকঃ

বউল পাঁজা

৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট,

বালী, হাওড়া, ৭১১২০১

মুদ্রকঃ বউল পাঁজা

প্রচ্ছদঃ শৈলেন পাত্র

প্রথম প্রকাশ - আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৫

মূল্যঃ দেড়শ টাকা

উৎসর্গ

কবি অনুপকুমার আচার্য
স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

উপন্যাসঃ

মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ

মনভূমি

ঝলমলি

ছুট

গোবু গোবিন্দ

গল্প সংগ্রহঃ

অন্য স্বাদ

পঞ্চশ্বর

গল্প পঞ্চক

জীবন যাপন

গ্রাস

কিশোর উপন্যাসঃ

রাজু নারাণের কীর্তি

ছড়ায় গল্পঃ

আটটা ঠাট্টা

কবিতাঃ

বন সবুজের মন (কবিতা সংগ্রহ, ১ম পর্ব)

স্থাবর অস্থাবর (কবিতা সংগ্রহ, ২য় পর্ব)

White Flowers

সূচীপত্র

গুণধরের বিবাহ

ক'দিন ধরে বাড়িতে কানাঘুষো শুনছিলাম আমার গুণধর ভাগিনেয় শ্রী মানস কান্তি ঘোষাল একটি প্রেম করেছেন এবং বিবাহের জন্য উদগ্রীব হয়েছেন।

আমি শ্রী সনাতন মুখুজ্জে, নিপাট ভালমানুষ, কারো সাতে পাঁচে থাকিনা, বিশেষতঃ বাড়ির আর বাড়ির সাথে যুক্ত এসব নানা ঘোঁটে তো নয়ই! তবে কি না কান খাড়া করে সংবাদের সর্বস্ব অনুধাবন করি। যদিও নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে উদাসীন থাকি। তা কান খাড়া করে রেখে যা শুনলাম ও বুঝলাম গুণধর আমাদের লতায় পাতায় দূর সম্পর্কের আত্মীয় শ্রী গোপীবল্লভ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাতনীর সঙ্গে প্রজাপতি প্রজাপতি খেলতে খেলতে একেবারেই ডানা ভেঙে ফেলেছেন।

আমাদের বাড়িতে বড়দার মেয়ের বিয়েতে ঠাকুর্দার সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে মেয়েটি এসেছিল, সেখানেই প্রেমের দেবতা অলক্ষে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিলেন, ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছেন।

অথচ গুণধর একশ শতাংশ বেকার, লেখাপড়াতেও মা লক্ষীর পেচক! কোনরকমে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছিল কিন্তু ঘাড় গুঁজে পড়েছে। এখন শখের ফটোগ্রাফি করে বেড়ায়। তবে কি না চেহারায় একেবারে কার্তিক ও অসুরের মিশ্রণ - অর্থাৎ দেখতে কার্তিক চেহারায় অসুর! তার ওপর সাজপোষাকে একেবারে পিটার ইংল্যান্ড এর বিজ্ঞাপন! তা মেয়ে তো ঘোল খাবেই!

সব সংবাদ অনুধাবন করে আমি বিশেষ পুলকিত হলাম কারণ এই আত্মীয়টির নাক উঁচু বাই আমাদের বাড়ির সকলকে পীড়িত করে। তবে কি না যদি গুণধর গেঁথে তুলে আনতে পারে তবেই আনন্দে ধেই ধেই, নতুবা দেবদাস হয়ে ঘুরে বেড়ালে এক গাল মাছি! গোপীবল্লভ মহাশয়ের নাক আরও উঁচু হয়ে যাবে, বলে বেড়াবে - ব্যাটা বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছে!

গুণধর তার মায়ের কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করেছে, শুনে তিনি - মানে আমার দিদি মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়! সব ব্যাপারেই পরামর্শদাতা বাপের বাড়ির

লোকজন। অবশ্যি আমি বাদে, কারণ আমি বাবা কারো সাতেপাঁচে থাকি না।

বাপের বাড়ির পরামর্শ দাতাদের মধ্যে প্রধান হলেন আমার মেজ বৌদি। তাঁর মতো মন্ত্রণা আর কেউ দিতে পারেন না। কিন্তু তিনিও নাকি শুনলাম বিশেষ কিছু পথ বার করতে পারেননি, কারণ গুণধরের বাবা - মানে আমার জামাইবাবু দিদির কাছে বিয়ের বি অব্দি শুনেই হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠেছেন - এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, বি? বলতে তোমার লজ্জা করছে না? তারপর যখন পাত্রীটি কে শুনেছেন তখন বলেছেন - আমার নিজের মাথা নিজে কামিয়ে ঘোল ঢালতে হবে।

কিন্তু ওদিকে শ্রীমতী এতই উতলা তিনি না কি চুড়ান্ত নোটিস জারি করেছেন যে তিনি বাড়ি থেকে চলে আসবেন, কারণ বাড়ি থেকে বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ফলতঃ গুণধর কতগুলি ঘুমের ট্যাবলেট সংগ্রহ করে গলাধঃকরণ করে বাড়িতে বলেছে - ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছি, মরেই যাব - বলে অর্ধঅচেতন অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে এবং কোনরকমে বাসে করে এসে মোড়ের মাথায় নেমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। ভীড় জমে গেছে, কেউ একজন চিনতে পেরে ভাইপোদের খবর দিয়েছে। - এসব শুনলাম অফিস থেকে ফিরে। গুণধরকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বমি করিয়ে আরো সব চিকিৎসা টিকিৎসা করে অষুধপত্র দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বিপদমুক্ত।

যদিও আমি কারো সাতেপাঁচে থাকি না, তবু স্নেহের ভাগ্নে বলে কথা! ছোটবেলা থেকে অনেক কোলেপিঠে উঠে অনেক আদর আবদার করেছে, ভালবাসিও বটে, দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম পাগলটা ভঁসভঁসিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ব্যাপারটা হচ্ছে বাপের তাড়া খেয়ে গুণধর মামার বাড়ি এসে দিব্যি খাচ্ছেদাচ্ছে ঘুমোচ্ছে আর ভাই বোনেদের সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। যদিও ব্যাপারটা বড়দের করোরই পছন্দ হচ্ছে না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝাচ্ছে - এটা সম্ভব নয়। কে বিয়ে দেবে? বিয়ের পর কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবি? কে দায়ীত্ব নেবে? কিন্তু নির্লজ্জ বেহায়া গুণধর নেই

আঁকড়ের মতো গোঁ ধরে বসে আছে - ও সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনলাম দিদি নিয়ম করে দুবেলা চোখের জল ফেলছে আর কপালকে দুষছে।

যদিও আমি বাবা কারোর সাতে পাঁচে থাকি না তবু ওই গোপীবল্লভ বুড়োর ওপর আমার মনে মনে একটা খার জমা হয়ে আছে। যদিও ব্যাপারটা বারো তেরো বছর আগের কথা, কারো মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার বিবাহ সংক্রান্ত।

আমার বিয়ের জন্য আমার বাবা প্রথম প্রস্তাব পেড়েছিলেন গোপীবাবুর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। ওনার ছেলের বিবাহে আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রণে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে বাবা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু গোপীবাবু এমন ভাব করেছিলেন যেন উনি মহারাজ গোপীচন্দ্র আর আমার বাবা ওনার তল্পিবাহক! বলেছিলেন - এমন কথা তুমি ভাবলে কি করে? আর যদিও বা ভেবেছ বলার সাহস হলো কি করে? নেহাৎ সেদিন বাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল না হলে না খেয়েই চলে আসতেন।

বাবা কথাটা মা কে বলেছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে বাড়ির সবাই জেনেছিল। যদিও নিজের কথা আর কি বলব, আমি পাত্র হিসেবে এমন কিছু ফেলনা নয়, আর ওনার মেয়েটিও এমন কিছু রূপসুন্দরী বা উচ্চ শিক্ষিত নয়। বরং আমার বিয়েটা অনেক ভাল পরিবারেই হয়েছে। আমি আর কি বলব, সবাই আমার স্ত্রীকে শিক্ষিতা ও সুন্দরীই বলে থাকে। তবু কি না সেই প্রত্যাখ্যান পুরুষ মানুষ হয়ে কি ভোলা যায়!

সাতে পাঁচে না থাকার প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে আমি একেবারে একশ ভাগ থাকব মনস্থ করলুম। অবশ্যই অতি সাবধানে, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। নিখুঁত প্ল্যান করে বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে হবে। সকলকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে। তারপর বিয়েটা হয়ে গেলে যত পার করো তুর্কি নাচন!

আজ রবিবার।প্ল্যান মাফিক একফাঁকে গুণধর ভাগ্নাকে চুপিচুপি বললাম - তোর সাথে কথা আছে, কিন্তু বাড়িতে নয়, বিকেল চারটের সময় বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে চলে আসবি, সঙ্গে মোবাইল রাখবি, কাউকে বলবি না, কেউ তোর পক্ষে নেই দেখছি, কিন্তু আমি আছি।

শুনে তো ভাগ্নাবাবু পায়ে পড়ে যায় আর কি!

- কি করিস, কি করিস, কেউ দেখে ফেললে গোড়াতেই সব মাটি হয়ে যাবে - বলে কোনক্রমে তাকে থামাই।

এক প্যাকেট বাদাম কিনে হাতিবাগান থেকে বাগবাজার হাঁটতে হাঁটতেই চললাম। মনে ডায়লগ গুলো সাজাতে লাগলাম কি কি জরুরী প্রশ্ন করতে হবে।

পৌঁছে দেখলাম গুণধর আগেভাগেই পৌঁছে গেছে।

- কেউ তো দায়ীত্ব নিচ্ছে না দেখছি, এখন তুই কি করবি ঠিক করেছিস?

- সামনের শনিবার সকালের দিকে ও কম্পিউটার ক্লাসে যাবার নাম করে চলে আসবে বলেছে, তারপর আমাকে যা করবার করতে হবে।

- সে কি রে? তাহলে হাতে তো মাত্র পাঁচ দিন সময়। - আমিও ঘাবড়ে গেলাম

- এত তাড়াতাড়ি কি ব্যবস্থা করবি? তুই কিছু ভেবেছিস?

- কালিঘাটে গিয়ে বিয়ে করে নোবো, তারপর ঝাড়খন্ড ঘুরতে চলে যাব।

- তারপর? কদিন থাকবি? কত টাকা আছে নিয়ে যাবি?

- তারপর মাকে ফোন করব টাকা পাঠাও।

- ঠাসিয়ে দোবো এক চড়। আমার দিদিকে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করবি? তাই বা কদিন? তাছাড়া ওদের মেয়ে হারিয়ে ওরা চুপ করে বসে থাকবে? তুই কি জানিস? মেয়েটার মেসোমশাই কোন থানার নাকি বড়বাবু?

- জানিতো।

- শোন, ওসব বিয়ের কোনো দাম নেই। যতক্ষণ না রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ হচ্ছে ততক্ষণ ওসব ভুয়ো। ওই বড়বাবু খুঁজে খুঁজে ঠিক তোদের তুলে নিয়ে আসবে। তারপর তোকে আগাপাশতলা ধোলাই দিয়ে উল্টোপাল্টা কেস দিয়ে হাজতে পুরে দেবে। আর মেয়েকে দুই ধমক দিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখবে। তখন দেখবি মেয়ে একটুও রুখে দাঁড়াতে পারবে না। তোর বাবা তোর জন্য কেস লড়তে যাবে? মেয়েটার ঠাকুর্দা খুব অহঙ্কারী আর জেদী লোক। প্রেম তখন ফুরুৎ করে উড়ে যাবে।

- ও মামা তুমি আমাকে বাঁচাও - গুণধর কান্নায় ফোঁসফোঁস করে উঠল। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবনা, ও বলেছে আমি কিছু ব্যবস্থা না করলে আত্মহত্যা করবে।

- আর কদিন সময় নিলে হয় না?
- ওদের বাড়ির সবাই জানতে পেরেছে। আমাকে চেনে তো। এখন একটু একটু বের হতে দিচ্ছে, এরপর আর বের হতেই দেবে না।
- ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়। চিন্তা করিস না। তবে কথা দিতে হবে আমাকে না জানিয়ে এক পা ও এগোবি না। আমি যেমন যেমন বলব ঠিক তেমন তেমন করতে হবে, আর কাউকে কিছু জানানো যাবে না। করবি? না হলে সব বরবাদ আর আমিও ফেঁসে যাব।
- প্রমিস করছি মামা, এই মা গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে প্রমিস করছি - গুণধর ছুটে গিয়ে হাতে করে গঙ্গাজল নিয়ে এসে বলল - মা গঙ্গা সাক্ষী!

মনে মনে বললাম - ওঃ! প্রেমে পড়লে মানুষের কি অবস্থা হয়!
- এদিকে সবাইকে তো বলেছিস দেখছি মেয়েটি চলে আসবে।
- ভেবেছিলাম বললে সবাই গুরুত্ব দেবে।
- এই যে বলছিস শনিবার চলে আসবে এটাও কি সবাই জানে?
- এটা শুধু মাকে বলেছি।
- তোর মা কি বলেছে?
- মা বলেছে আমার সঙ্গে যাবে আনতে।
- সে কি রে?
- মা বলেছে মেয়েটা আসবে বলে যদি না আসে তখন তুই আবার কি করে বসবি! একবার তো ঘুমের অষুধ খেয়েছিস! মেয়েটা এলে তোরা যেথা খুশি যা, যা খুশি করিস জানি না। আমি আমার বাড়ি চলে যাব।

বোঝো ঠ্যালা! মেয়েটা পালিয়ে আসবে, ছেলের মা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! এমন কান্ড জীবনে এই প্রথম শুনলুম!
- ঠিক আছে, একটু ভাবি দাঁড়া। এই নে টাকা, ওই তেলেভাজার দোকান থেকে দুজায়গায় মুড়ি আর আলুর চপ নিয়ে আয়।

বাঙালির পেটেন্ট খাবার মুড়ি আর তেলেভাজা, তারপর এক ভাঁড় চা, - এ না হলে বুদ্ধি খোলে না। খাওয়া শেষেই বুদ্ধি খুলে গেল। বললাম - ঠিক আছে, দুজনের আধারকার্ড, প্যানকার্ড, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট,বার্থ সার্টিফিকেট

এসবের কয়েক কপি জেরক্স আর কয়েক কপি পাসপোর্ট ফটো সব রেডি করে রাখবি, অবশ্যই সেদিন সঙ্গে নেওয়া চাই, না হলে কিন্তু কিচ্ছু হবেনা।
- ঠিক আছে মামা। ওসব তো করাই থাকে। কিচ্ছু ভুল হবে না।

শনিবার দিন যথারীতি খাওয়া দাওয়া করে অফিস না গিয়ে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের গেটের কাছে নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়ালুম। অপেক্ষা করে করে যখন পা ব্যথা তখন তিনজনকে বের হতে দেখলুম।

হায় ভগবান! এই মেয়ের জন্য ভাগ্নাবাবু পাগল? অবশ্য সুশ্রী চেহারা, মাঝারি রঙের দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির মুখটা যদিও একটু শুকনো শুকনো তবু ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ আছে। পরনে কমলা রঙের তাঁতের শাড়ি, কাঁধে একটা ব্যাগ। গুণধরের হাতে দেখছি বেশ বড় একটা ট্রলি ব্যাগ। বেশ তৈরি হয়েই এসেছে দেখছি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দিদি কাঁদছে, হাবেভাবে বুঝলাম দিদি জিজ্ঞেস করছে কোথায় তোরা যাবি?
- কালিঘাটে যাব বিয়ে করতে - ভাগ্না এরকম কিছু বলল বোধহয়, দিদি সঙ্গে যেতে চাইছে মনে হয়।

এসব কান্নাকাটি দেখে দুতিনজন দাঁড়িয়ে গেছে, খুব মুশকিলের ব্যাপার। অতএব আমাকে এগিয়ে যেতেই হলো।
- কি রে, তোরা এসে গেছিস? - বলে এগিয়ে যেতে কৌতুহলী লোকেরা সরে গেল। দিদি অবাক হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অভাবনীয়।
- আমার ছোট মামা, আর এ হচ্ছে অনন্যা।

নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেলে আমি বললাম - ভাল থাকো।
- মামা আমাদের নিয়ে যাবে - ভাগ্নাবাবু ঘোষনা করল।
- ও, তুই এর মধ্যে আছিস তাহলে? তাই ভাবি মানস এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে। এদিকে বলে বেড়াস আমি কারো সাতে পাঁচে থাকি না।
- উল্টোপাল্টা বোকোনা তো - চাপা গলায় বললাম আমি - এদিকে ফাঁকায় একটু সরে এসো, হ্যাঁ, তোমার ছেলে যা করতে যাচ্ছিল তাতে হাতকড়া

পড়ত। কেউতো মাথা দিচ্ছে না। নেহাৎ ছোট থেকে ভালবাসি, তাই। এখন আমাকেই দোষী করা হচ্ছে।

- কোথায় নিয়ে যাবি ওদের?

- এখন যাব শিয়ালদায়, একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে, কথা বলে রেখেছি, বিয়ের নোটিস দিতে হবে।

- আমিও যাব - দিদি বলল।

মুহূর্তে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ছেলের মা যদি সাক্ষী হয়ে সই করে তাহলে আমার দায়ীত্ব হালকা। বললাম - বেশত চলো।

অতঃপর একটা ট্যাক্সি করে গেলাম, যথারীতি কাগজপত্র ফটো ইত্যাদি দিয়ে সবাই সই করে নোটিস দেওয়ার কাজ মিটতে ঘন্টাখানেক লাগল।

- আগামীকাল অনুষ্ঠান করে বিয়ে হবে? - রেজিস্ট্রার জিজ্ঞেস করলেন।

- হ্যাঁ স্যার - বললাম আমি।

- অনুষ্ঠান করে বিবাহের কয়েকটা ছবি তুলে দু এক দিনের মধ্যে জমা দিয়ে যাবেন। পনের দিন পর আসবেন, রেজিস্ট্রি হবে।

বাইরে এসে দিদিকে নিয়ে পড়লাম - এবার যা বলি ভাল করে শোন, এখন আর সঙ্গে যাব বলে বায়না করলে হবে না। তুমি তোমাদের বাড়ি চলে যাও। আমি ওদের নিয়ে যাব একটু দূরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে বন্ধু সব ব্যবস্থা করে রাখবে। কাল গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে সব নিয়ম মেনেই গোধুলি লগ্নে বিয়ে হবে। সব কথা পেটের মধ্যে রাখবে। ভুলেও কাউকে কিছু বলে বসবে না। দেখোনা, কালকেই তোমাদের বাড়িতে আর আমাদের বাড়িতে ওই পুলিশ মেসো এসে না হাজির হয়! খুব সাবধানে থাকবে।

- তুই কি ওখানেই থাকবি?

- মাথা খারাপ! আমি ওদের পৌঁছে দিয়েই চলে আসব। যেমন অফিস যাই কালকে তেমনি বেরিয়ে ওখানে যাব। বিয়ে দিয়ে আবার চলে আসব। বাড়িতে বলব নিমন্ত্রণ আছে।

দুজনে মাকে প্রণাম করল, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে

দিদিও কেঁদে ফেলল, ছেলে বউও কেঁদে ফেলল। ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে প্রেমের পুলক পুঁ-উ করে উড়ে গেছে। ধেৎ, এসব কান্নাকাটি ভাল লাগে না। মনটা একেবারে মিইয়ে গেল। আমার চোখটাও ভিজে ভিজে গেল। দিদিকে বাসে তুলে দিলুম।

- অনন্যা, এবার তোমার মোবাইল থেকে তোমার মাকে একটা ফোন কর, বল - মা, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি মানসের কাছে, বিয়ের জন্য, আর ফিরব না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

অনন্যা ভয়ার্ত চোখে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে কাঁদতে লাগল।

- এ তো ভারি মুশকিল হলো। না বললে ওনারা তো আরও চিন্তায় পড়ে যাবেন। এই মানস, তুই বল।

- আমি?

- হ্যাঁ, বল - আমি মানস বলছি, অনন্যা আমার কাছে আছে। আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি। - ওর ফোন থেকেই বল - কড়া গলায় বললাম আমি।

- নম্বরটা লাগিয়ে দাও -

নম্বর লাগিয়ে দিল অনন্যা। কোনো রকমে কথাটা বলে দিলো মানস, ওদিক থেকে তখন চিৎকার ভেসে আসছে - অনু কোথায়? অনু? অনু-উ -

আমি ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সুইচ অফ্ করে দিয়ে ফোনটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। মানসের ফোনটাও চেয়ে নিয়ে সুইচ অফ্ করে নিজের কাছে রাখলাম। অসহায় মায়ের ওই করুণ চিৎকার কানে ভাসছে, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কি যে হবে! কিন্তু আর পিছনে ফেরার উপায় নেই।

নিঃশব্দে আমরা শেয়ালদা স্টেশনে এলাম, ট্রেনে উঠলাম, ঘন্টাখানেক ট্রেন জার্নি করে নেমে বন্ধু অনুপমকে ফোন করলাম - আমরা এসে গেছি।

তখন বিকাল, কেমন একটা দমবন্ধ অবস্থা।

বন্ধু অনুপমের বাড়িতে স্ত্রী, ওর মা, আর বছর দশেকের ছেলে, কিন্তু পাশাপাশি কাকা জ্যাঠার বাড়ি। সকলকেই বলেছি, নিমন্ত্রণ করেছি। প্রায় চল্লিশের মতো লোক হবে। গত পরশু দিন এসেছিলাম, সব ব্যবস্থা করে গেছি।

বেশ একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারের মধ্যে আবহাওয়া ফুরফুরে হয়ে গেল।

- আগে ওদের কিছু খেতে দাও - বললাম আমি।

বাড়ি ফিরে দেখলাম বাড়ির আবহাওয়া খুব থমথমে। স্ত্রী চুপি বলল - জানো, মানস নাকি গোপীবাবুর নাতনীকে নিয়ে পালিয়েছে। ওরা একটু আগে দিদির বাড়িতে গিয়েছিল, ওদের কে আত্মীয় আছে দারোগা, উনি, সঙ্গে দুজন পুলিশ। দিদি ফোন করে বলল।

- আমি বাপু কারো সাতে পাঁচে থাকি না - বেশ জোরে জোরে বললাম - যত সব উদ্ভট কান্ড! চা নিয়ে এসো।

- বাবাঃ, বেশ মানুষ যা হোক! এতবড় একটা কান্ড, না ভাবলে চলে? নাঃ! উনি সাতেও নেই পাঁচেও নেই! - হাত নেড়ে ভেংচি কেটে স্ত্রী চলে গেল।

পরদিন সকালে একটু তাড়াতাড়িই তৈরি হচ্ছি, স্ত্রীকে বললাম - আজ আমার ফিরতে দেরি হবে, একটা নিমন্ত্রণ আছে, আমার খাবার রাখবে না।

- তুমি কি আজ অফিস যাবে? বড়দা বলছিলেন - আজ ওই দারোগা বাবু যদি লোকজন নিয়ে আসেন?

- কি আশ্চর্য! দারোগাবাবু এলে কি সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবেন? - আমি একটু উঁচু গলায় বললাম - আমাদের এত ঘাবড়াবার কি আছে? বলবে - শুনুন মশায়, আমরা কারো সাতে পাঁচে থাকি না, এই বাড়ির একতলা থেকে তিনতলা সব ঘর খোলা আছে, ঘুরে দেখে নিন, যদি আপনাদের মেয়ে থাকে তো নিয়ে যান, শুধু মেয়ে কেন, গুণধর ভাগনা যদি থাকে তাকেও বেঁধে নিয়ে যান। তবে হ্যাঁ, কুটুম্ব মানুয, এই প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন, অবশ্যই খাওয়াদাওয়া করে যাবেন। ব্যস, মিটে গেল!

অফিসের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ব্যাগে ওদের দুদুটো মোবাইল। ভাগ্যিস সুইচ অফ করা আছে! ভেতরে ভেতরে কিন্তু বেশ নার্ভাস লাগছে। পুলিশ এসেছিল মানে গুণধরের নামে থানায় ডায়রি করেছে নাকি? যাকগে, যা হবার হবে, এখন আর কিছু করার নেই। গলি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি দিদি দাঁড়িয়ে, হকচকিয়ে গেলাম - তুমি এখানে?

- কাল পুলিস এসেছিল, আমার খুব ভয় লাগছে - কেঁদে ফেলল দিদি।
- কি জানি? এখানেও কাউকে নজরদারি করতে পাঠায়নি তো? - আমি ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখলাম - তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে খুব ভুল করেছ।

একটা বাস এসে দাঁড়াতে তাড়াতাড়ি দিদিকে নিয়ে উঠে পড়লাম। না, আমরা ছাড়া আর কেউ উঠল না।

- তুই আমাকে নিয়ে চল, আমার মন মানছে না। আমি মা, আমি থাকলে বুক দিয়ে আগলে রাখব - ফিসফিস করে বলল দিদি - তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, সে নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছে।

ভেবে দেখলাম ঠিক কথা, ছেলের মা উপস্থিত থাকলে সত্যিই আমার ভার লাঘব। কিন্তু কেউ ফলো করছে না তো? মনে তো হয় না। যা হবার হবে।

ছেলের মা কে পেয়ে সবাই আরো উচ্ছাসিত। গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে গোধুলি লগ্নে বিবাহ পর্যন্ত সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। মোবাইলে অনেক ছবি তুললাম। দিদি মেয়েটিকে বেশ আপন করে নিয়েছে। মেয়েটার মনের ভার নেমে গেছে, বেশ উৎফুল্ল লাগছে, দেখে তৃপ্তি বোধ করলুম। সবাই বলল - আহা, কি সুন্দর জামাই, যেন সাক্ষাৎ অর্জুন!

- হ্যাঁ, নাতি আমার সুভদ্রা হরণ করে এনেছে - বললেন বন্ধুর মা, উনিই কন্যা সম্প্রদান করলেন।

শিয়ালদায় এসে দিদিকে একটা ওলা বুক করে দিলাম, বললাম - বাড়িতে বলবি ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর কোনো কথা নয়, খাওয়া তো হয়েই গেছে, খিদে নেই বলে শুয়ে পড়বি।

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে রাত দশটা। তখন সবাই খাওয়া দাওয়া করছে। বড় বৌদি বললেন - বেশ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এলে, এদিকে আমরা পুলিশের জেরায় জেরবার!

- আমি বাবা কারো সাতে পাঁচে থাকি না - বলে আমি পা বাড়ালাম ঘরের দিকে। কিন্তু শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না। এবার পনেরো দিনের অজ্ঞাতবাস, তারপর রেজিষ্ট্রি। কোথায় রাখব ওদের মোটামুটি ভেবে রেখেছি। কিন্তু সেটা স্ত্রীকে বলতে হবে।

আমার শাশুড়ি মা একাই থাকেন। একমাত্র শ্যালক কর্মসূত্রে বাঙ্গালোরে। অতএব আমাকেই খবরাখবর দেখাশোনা করতে হয়। হাতিবাগান থেকে দক্ষিণেশ্বর দূরত্ব বেশি নয়, সপ্তাহে বা পনেরো দিনে একবার যেতেই হয়। উনি আমাদের ওপর খুবই নির্ভর করেন। দোতলা বাড়িতে থাকার জায়গাও যথেষ্ট। ওখান থাকলে কেউ জানতেও পারবে না।

অনেক রাতে ছেলেমেয়ে ঘুমালে স্ত্রীকে বারান্দায় ডেকে চুপিচুপি বললাম - বিয়ে তো ওদের হয়েই গেছে,এই দেখ ছবি। - মোবাইলে ছবিগুলি দেখালাম।

- দিদিও তো রয়েছে দেখছি, এ কোথায়?

- আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

- ও বাবা! তোমার পেটে পেটে এত! এই তুমি সাতে পাঁচে থাক না!

- এখন পনেরো দিন ওদের আড়ালে রাখতে হবে। তারপর রেজিস্ট্রিটা হয়ে গেলে ব্যস, আর কেউ কিছু করতে পারবে না। ভাবছি মায়ের কাছে রাখব।

- এ্যাঁ! - মাধুরী আকাশ থেকে পড়ল।

- কাল ওদের আনতে হবে, আমি বেরিয়ে গেলে তারপর তুমি মায়ের কাছে গিয়ে সব বলে ব্যবস্থা করবে। ওদের নিয়ে আসতে আসতে বিকাল হয়ে যাবে।

- কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায়?

- তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। দিদিকে বলব ওরা বেড়াতে চলে গেছে। অবশ্য তুমি যদি কাউকে বলে ফেল -

- ওঃ! দারুণ থ্রিলিং! - মাধুরী রোমাঞ্চিত!

ওদের দুজনের মোবাইল আনার কাছে। অনন্যার মোবাইল অন করলাম, কয়েকটি ছবি যেগুলিতে আমি বা দিদি নেই সেগুলি আমার ফোন থেকে অনন্যার ফোনে পাঠিয়ে তারপর সেগুলি অনন্যার ফোন থেকে ওর মায়ের ফোনে পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে দু লাইনের মেসেজ - শ্রীচরণেষু বাবা ও মা, আমাকে ক্ষমা কর, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আশীর্ব্বাদ কর। আমরা ভাল আছি, চিন্তা কোরো না। ভাল থেকো। - ইতি অন্যনা। দুটো ফোনই সুইচ অফ্ করে দিলাম। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।

কন্যা বিদায়! এ এক আশ্চর্য মুহূর্ত! এই ক ঘন্টা সময়েই সবাই কেমন

আপনজন হয়ে গেছে। সবার চোখে জল, আমারও।

টোপর আর মুকুট তোলা রইল আলমারির মাথায়,বেনারসীর বদলে একটি সিল্কের শাড়ি পরে চলল কনে। বরের সাজ পাঞ্জাবী পাজামা। কিন্তু কি আশ্চর্য, দেখেই মনে হচ্ছে ওরা নববিবাহিত।

পুলকে রোমাঞ্চিত আমার স্ত্রী কি যে করবে আর কি যে করবে না ঠিক করতে পারছে না।

- তুমি আজকে থাকো - স্ত্রীকে বললাম - ওদের ভাল করে বুঝিয়ে সব গোছগাছ করে কাল আসবে।

ওদের বললাম - তোমরা কিন্তু হুটহাট বাইরে বেরোবে না, খুব সাবধান, নাহলে তোমরাও ফাঁসবে, আমাদেরও ফাঁসাবে। অফিসে পাঁচ দিন ধরে ধুম জ্বর বলে ছুটি নিয়ে চালাচ্ছি, কাল থেকে নিশ্চিতে অফিস করতে পারব। তোমাদের মোবাইল এখন আমাদের কাছেই থাকবে। বৌমা, তোমার ফোন থেকে বিয়ের কয়েকটা ছবি তোমার মাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে দুলাইনের মেসেজ, দাঁড়াও, তোমাদের দেখাচ্ছি।

সাত দিনের রোমাঞ্চকর অভিযানের পর অফিসে নিজের খোঁয়াড়ে ঢুকে স্বচ্ছন্দ এবং নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কেটে যাচ্ছে নির্বিবাদে। অফিস না এলে যেন পেটের ভাত হজম হয় না! কোম্পানি আমাকে পদাধিকার বলে একটি ছোট চেম্বার দিয়েছে, এটাই আমার খোঁয়াড়!

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মাধুরীর কাছে সংবাদ জানতে চাই, না, কোনো সংবাদ নেই। এমন নিস্তরঙ্গ আবহাওয়ায় ঝিমিয়ে পড়ি। গরম চা ও মুখে ঠান্ডা লাগে। রাত্রে মাধুরী চুপিচুপি মায়ের কাছে খবরাখবর নেয়। মাধুরী ওদের একটা নাম দিয়েছে - ' বান্টি-বাবলি '। বলে - বান্টি-বাবলি হানিমুনে ভালই আছে! মেয়েটি অবশ্য মায়ের হাতে হাতে কিছু কিছু ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না করে।

কিন্তু গোপীবল্লভ বাবুর বাড়ি থেকে কোন রকম গরমাগরম ধমকধামক না শুনলে মনটা যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না। যুদ্ধ না করে প্রতিপক্ষ ওয়াক ওভার দিয়ে দিলে আনন্দ কি? অহঙ্কারী বুড়োবাবু, তস্য পুত্র - মেয়ের বাবা দেমাকী বড়বাবু

একটুও হুঙ্কার দিলেন না! বড্ড গা টা নিসপিস করছে। যাকগে, অহঙ্কারের দূর্গে কামান দাগা গেছে তো!

দেখতে দেখতে বারো দিন হয়ে গেল। রবিবার বিকালে গেলাম বান্টি-বাবলির সাথে দেখা করতে, দেখি দুজনে লুডো খেলায় ব্যস্ত। একটু ভিডিও তুলছি এর মধ্যে ওরা হাসি মুখে তাকাল। ব্যস ব্যস, এটুকুই দারুণ! পাঠিয়ে দিলাম বেয়াইমশায়ের ফোনে। ওর মেয়ের ফোন থেকেই পাঠালাম, সাথে মেসেজ - সুখী দম্পতি!

দিদিকে ফোন করলাম - হ্যাঁ দিদি, দিনতো শেষ হয়ে এলো, কদিন পরেই রেজিষ্ট্রি, এরপর কি করবি?

- ওরা কোথায় আছে? - দিদির কৌতুহল।

- কোলকাতাতেই আছে।

- কি আর করব, বিয়ে যখন হয়েই গেছে ছেলে-বউকে ঘরে তো তুলতেই হবে। আমি তোর জামাইবাবুকে বলেছি - মানস ফোন করে বলল বিয়ে হয়ে গেছে, কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। যাই হোক, বিয়ে যখন হয়েই গেছে ছেলেকে তাড়িয়ে তো দিতে পারব না।

- কি বলল?

- কিছু বলেনি, চুপচাপ শুনেছে।

পরদিন দুপুরে অফিসে কাজে ব্যস্ত বেয়ারা এসে স্লিপ দিল, নাম দেখে চমকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম - কোথায় উনি?

- ভিজিটার্স রুম এ।

তাড়াতাড়ি ছুটলাম, দেখলাম উনি গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, হাত ধরে বললাম - আসুন।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। অনেক বছর পর দেখলাম, বার্ধক্য অনেক জীর্ণ করেছে, তবু ঋজু শরীর। উনি দাঁড়িয়েই আছেন। আবার বললাম - আসুন, আমার ঘরে আসুন।

চেম্বারে এসে আমার চেয়ার টেনে বললাম - বসুন।

একটু ইতঃস্তত করে বসলেন, আমি দাঁড়িয়ে। বললেন - তুমি বসবে না?

- হ্যাঁ বসছি - সামনের চেয়ারে বসলাম।

একটু সময় চুপচাপ, হয়ত কি বলবেন মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

- তোমাদের বাড়ির আর কারো অফিসটফিস আমার জানা নেই, একমাত্র তোমার অফিসের নামটাই তোমার বাবা বলেছিলেন। নাম করা কোম্পানি, মনে আছে, তোমার কাছেই এলাম। অবশ্য তোমাদের বাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল। - একটু চুপচাপ - তোমরা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল সম্পর্কটা কাছাকাছি করার। আমার দুর্ভাগ্য আমি সেটা পারিনি।

- দুর্ভাগ্য কেন বলছেন, আপনারা অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ!

- না - উনি দুপাশে মাথা নাড়লেন - উচ্চ অহঙ্কারের মানুষ। আমার বড় ছেলেও সেই অহঙ্কার ধরে বসে আছে। কিন্তু আজ মনে হয় অহঙ্কার হচ্ছে বিষ, অনেক কিছু ধ্বংস করে দেয়, যেমন আমি ধ্বংস করেছি।

আমি অবাক হয়ে চুপ করে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে। ওনার মেয়ের জীবনে কি কোনো দুরবস্থা? কিন্তু তার তো বিয়ে হয়েছিল অনেক বড় ঘরে, আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

- যাক সেসব কথা, তোমার বাবা মা আজ নেই, কিন্তু তাদের ইচ্ছে আজ পূরণ হয়েছে। আমিও খুশি হয়েছি।

- কি বলছেন! আপনি -

- ছেলে বলে, ওই মেয়ের মুখ আমি আর দেখতে চাই না, কিন্তু আমার মনটা হু হু করে, কতদিন ওকে দেখিনি, মেয়েটা বড্ড ভাল। - বলতে বলতে ওনার চোখ ছলছল।

আমি উঠলাম, বললাম - চলুন -

- কোথায়?

- আপনার নাতনির কাছে।

মাকে ফোন করলাম - মা, একটু মানসকে ডাকুন -- হ্যাঁ, মানস, বউমাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চলে যা, মায়ের মন্দিরের সামনে নাট মন্দিরের

সিঁড়িতে বসবি, আমি আসছি, সঙ্গে - আচ্ছা দেখতেই পাবি সঙ্গে কে!

তারপর কান্নাকাটি হাসনহাটি! দুপাশে নাতনি নাতজামাই মাঝখানে দাদু, আমি ফেকলুর মতো দাঁড়িয়ে জুলজুল করে দেখছিলুম।

আমি বাবা কারো সাতে পাঁচে থাকি না!

ভজনের দূরদর্শন ও সিদ্ধিলাভ

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : একদা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁহাদের সম্যক উপলব্ধি ছিল, সেই বুদ্ধিমান মনুষ্যদিগকে দূরদর্শী বলা হইত। অর্থাৎ তাঁহারা বর্তমানে অবস্থান করিয়া ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে পারিতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাবিহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন।

সে কাল অতীত হইয়াছে। বর্তমান কালে দেড় হস্ত পরিমান দীর্ঘ, এক হস্ত পরিমান প্রস্থ্ এবং এক হস্ত পরিমান উচ্চতা বিশিষ্ট এক প্রকার পেটিকা - যাহার সম্মুখভাগ এক বিশেষ ধরনের কাচ দ্বারা নির্মিত, যাহার আদরের নাম ইংরাজিতে ' ইডিয়ট বক্স 'অর্থাৎ নির্বোধ পেটিকা বা বোকা বাক্স - যাহার সম্মুখে বসিয়া মনুষ্যগণ অষ্টপ্রহর ধরিয়া চলমান দৃশ্য দর্শন করেন তাহাকে দূরদর্শন বলা হইয়া থাকে)

ভজন দাস মহাশয়ের পিতার নাম সাধন দাস, তস্য পিতা গোবর্দ্ধন দাস। পরম বৈষ্ণব গোবর্দ্ধন দাস মহাশয় ভক্ত মানুষ ছিলেন। এসব নাম তিনিই রেখেছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন বংশধরেরা সাধন ভজনের মাধ্যমে ভবসংসারে সিদ্ধিলাভ করবেন। তৎকালে তাঁহার বাড়িতে শুদ্ধ নিরামিষ আহারাদির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পুত্র সাধন দাস মহাশয় রেল কোম্পানিতে চাকুরী পাওয়ার পর থেকেই নানা অজুহাতে দুপুরের খাওয়া বাইরেই সারছিলেন।

অতঃপর মাতৃদেবী স্বর্গগত হলেন। সাধনের বিবাহের জন্য গোবর্দ্ধন উদ্যোগী হলেন। কিন্তু পুরোপুরি নিরামিষাশী বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা পাওয়া গেলনা। অগত্যা মাছ চলে মাংস চলেনা - এরকম একটি মধ্যবর্তী পরিবারের কন্যাকেই নির্বাচন করলেন। কন্যাকে পাত্রস্থ্ করার তাগিদে কন্যার পিতা জানালেন - তাঁর কন্যাটি মাছের বিশেষ ভক্ত নয়।

অতঃপর পিতৃদেব স্বর্গগত হলেন এবং সাধনও আমিষে

সিদ্ধিলাভ করলেন। তবে কি না মুরগীর মাংস বা ডিম্ব ভক্ষণ করতেন না। অতঃপর তস্য পুত্র ভজন! তার কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ভজনবাবুর ব্যবসাটি পুরোপুরি নিরামিষ।ঝাল চানাচুর, মিষ্টি চানাচুর, টকঝাল, মিষ্টি ঝাল, আবার টক জাল মিষ্টি কিচ্ছু নেই শুধুই নোনতা চানাচুর - এমন হরেক চানাচুরে শোভিত ভজনদাসের দোকান।দোকানের নাম ক্রমে ক্রমে গলি ছাড়িয়ে পাড়া, পাড়া ছাড়িয়ে শহরময়। ভজন যখন ছোট ছিল তখন তার লজেন্সে লোভ ছিল না, চকোলেটে লোভ ছিল না, এমনকি রসগোল্লা পান্তুয়া সন্দেশেও তার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; একমাত্র আগ্রহ ছিল হরিদাসের বুলবুল ভাজায়। ঘুঙুর পায়ে ঝুমুর ঝুম শব্দ তুলে যে লোকটি বিকালবেলায় পাড়ায় আসত আর পুলিশের বাঁশির মতো একটা বাঁশি বাজিয়ে তারপর ঘোষনা করত - এই যে এসে গেল হরিদাসের বুলবুল ভাজা - তার সেই কণ্ঠস্বরের জন্য ছোট ভজন - অর্থাৎ ভজুর কি আগ্রহ! তখন থেকেই ভজু ভাবত বড় হয়ে সে চানাচুরের দোকান করবে, আর যত ইচ্ছা চানাচুর খাবে। যদিও সে তখন চানাচুর উচ্চারণ করতে পারতো না, বলত - চাচানুর। বস্তুতঃ পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে এটা হয়ে উঠেছিল একটা মজার খেলা। সকলেই তাকে জিজ্ঞাসা করত - বড় হয়ে তুমি কি করবে ভজু? ভজু গম্ভীর মুখে বলত - চাচানুর বিক্লি কলব।

তা সে চানাচুরের দোকান ভজুর হয়েছে। ছোট্ট থেকে ছোট, ছোট থেকে মেজ, মেজ থেকে বড়, খুচরো থেকে পাইকারি, পাইকারি থেকে - সে সব অনেক ইতিহাস। মোটামুটি বলা যায় এই তিরিশ বছর বয়েসে ভজু চানাচুরে সিদ্ধি লাভ করেছে। ভজু থেকে ভজনবাবু হয়েছে, দাদুর নোনাধরা দুকামরার বাড়ি ভেঙে হালফ্যাসানের বাড়ি করেছে, বিয়ে করেছে, এক পুত্র এক কন্যার পিতা হয়েছে, পুত্র কন্যাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে দিয়েছে, মোটর বাইক তো কিনেছেই, মারুতি কিনবো কি কিনবো না ভেবে আগুপিছু করছে - লোকের চোখ টাটাবে। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা যে কালীমন্দির করেছে তাতে বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছে ভজনবাবু, ক্লাবের কমিটিতেও স্থান পেয়েছে, বারোয়ারী পূজাগুলিতে ভালই চাঁদা দেয়।তাছাড়া ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে গলাগলিটা

ভালই বজায় রেখেছে। একটু বেশিই রেখেছে বলা যায়। মাসে অন্ততঃ একবার স্ত্রীকে পুত্র কন্যাসহ পিত্রালয়ে পাঠিয়ে বাড়িতে বন্ধুদের নিয়ে মজলিস বসায়, পানভোজনের ঢালাও বন্দোবস্ত হয়। ভজনবাবুর প্রিয় বন্ধু ভানু রন্ধনে অত্যন্ত পটু। পান করতে করতে তিনি চিকেনের বিভিন্ন পদ রন্ধন করেন। বস্তুতঃ পান করতে করতে রন্ধন, কিংবা রন্ধন করতে করতে পান এটাই তার নেশা। টেবিলে বসে পান করে তিনি তৃপ্তি পান না!

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভজনবাবু মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছে। বন্ধুবর্গ সহ বছরে দু-তিনবার একত্রে তারপীঠ যায়, ভক্তিসহকারে পূজার্চনা যজ্ঞাদি করে এবং পিপে পিপে মদ্যপান করে তুরীয় আনন্দ উপবোগ করে।

কিন্তু এতৎসত্বেও ভজনের মনে সুখ নাই। কিছুদিন যাবৎ একটি না পাওয়ার দুঃখ তাকে ম্রিয়মান করে রেখেছে। বিশেষতঃ এবার তারাপীঠে এসে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত মদ্যপান করে সবান্ধবে যখন শ্মশানে বিচরণ করছিল এবং মা মা ডাকে উদ্বেলিত হচ্ছিল তখন তার বুকে সেই দুঃখ ঝড়ের সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী ক্ষীণ স্রোতা দ্বারকা নদীতে ভজন সেই ঝড়ের সমুদ্রের প্রতিরূপ দেখতে লাগল। তার চোখদুটি সজল হয়ে উঠল। উদাত্ত কন্ঠে সে ডাক দিল ' মা '! সে নিনাদ কী গভীর! কন্ঠ থেকে নয়, সে শব্দ নাভি থেকে কন্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ থেকে উদ্ভূত হলো। একেবারে পাশেই ছিলেন বল্টুদা, তিনি বললেন - কি হলো ভজু? তোকে কেমন কেমন যেন লাগছে, বেশি খেয়ে ফেলিসনি তো?

বল্টুদা এই পাঁচ ইয়ারের ষষ্ট জন। বয়সে সিনিয়ার। অন্ততঃ বছর পনেরো বড়। কিন্তু ব্যাচেলার। এ দলের আসরে তিনি নিয়মিত নন। কিন্তু যেদিন আসেন সেদিন সকলের সামর্থের অর্ধেক পরিমান একাই উদরস্থ করেন। শুধুই বলেন ঢাল ঢাল ঢাল! 'ঢাল' কথাটা একবার বলে তাঁর ঠিক তৃপ্তি হয় না, মনে হয় বলাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, অতএব তিনবার বলেন।

ফ্লিম লাইনের লোকেদের সঙ্গে নাকি বল্টুদার ওঠা বসা। চুনো পুঁটি নয়, সব উঁচু লেবেল - অর্থাৎ পরিচালক প্রযোজক ইত্যাদি স্তরের মানুষজনের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম।

অবশ্য সবই বল্টুদার মুখনিঃসৃত বানী থেকে জানা। যদিও কাজকর্ম তিনি কি করেন সে বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করেন না। বাড়িতে বৃদ্ধ বাব মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবা বড় সরকারী চাকুরী করতেন, ভাল পেনশন পান, এটা পাড়ার সকলেই জানে।

ইদানিং অবশ্য বল্টুদা টি. ভি.র গল্পই বেশি করেন। অমুক বিখ্যাত মেগাসিরিয়াল, তমুক বিখ্যাত টেলিফ্লিম, এসব তাঁর কাছে জলভাত। কথায় বার্তায় বুঝিয়ে দেন ওইসব লোকেদের সঙ্গেই তাঁর প্রায় রোজ পান ভোজন। ভজুদের আসরে যে মাঝেমধ্যে আসেন সে নেহাতই পাড়াতুতো ভ্রাতৃভালবাসায়।

তা একদিন ভজনের বাড়ির আসরে ফূর্তি যখন চরমে এবং বল্টুদা পরিতৃপ্ত তখন ভজন বলল - বল্টুদা, আমাদের একদিন সুটিং দেখান না। সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল - হ্যাঁ হ্যাঁ বল্টুদা, দেখান না।

- এ আর এমন কি ব্যাপার! - বল্টুদা বললেন - এ তো যে কোনোদিন গেলেই হয়। শুধু একবার পরিচালককে বলে নিতে হবে।কারণ আর কিছুই নয়, দল বেঁধে পাঁচজন যাবিতো, একজন হলে কালই চলে যেতিস্, ফ্লোরের একধারে দাঁড় করিয়ে দিতুম।

- না না বল্টুদা, ওসব আলফাল কোনো একটা সুটিং দেখিয়ে দিলে হবেনা, ওই যে হিট মেগাসিরিয়ালটা, যেটা বছরের পর বছর চলছে, ওই যে গো - জননী জন্মভূমিশ্চ - ওটার সুটিং দেখাতে হবে।

- ঠিক আছে - উদার কন্ঠে বললেন বল্টুদা।

- ছোটমোটো আর্টিস্টের নয় কিন্তু - ভজন বলল - বড় আর্টিস্ট -

- এইতো আবার এক ফ্যাচাং জুড়িস্ -

- থাক তবে দেখাতে হবে না।- আহা হা, রাগ করছিস কেন, হবে হবে, নে নে, কখন থেকে বকবক করে গলা শুকনো হয়ে গেল, তলানি যা আছে ঢাল ঢাল ঢাল।সবাই চোখ পিট পিট করছিল আর মিচকি মিচকি হাসছিল, মানে - বোঝো এবার! বল্টুদাকে আচ্ছা প্যাঁচে ফেলা গেছে! বল্টুদা কিন্তু ধরে ফেললেন, বললেন - কি রে ব্যাটা? ভাবছিস পারব না? ওরে তোদের সুদ্ধু ধরে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, জানিস? এখন বল, সুটিং দেখালে কি দিবি?

- এবার যখন তারাপীঠ যাবো তোমাকে নিয়ে যাবো, খালি পকেটে যাবে খালি পকেটে আসবে - ভজন বলল - এমনকি সিগারেট পর্যন্ত ফ্রি! তা সেই শুভদিন এলো। পাঁচজনে ট্যাক্সি করে টালিগঞ্জে স্টুডিও পাড়ায় হাজির। কথা মতো অমরাবতী স্টুডিওর সামনে ট্যাক্সিওলা নামিয়ে দিলো। কথা ছিল বল্টুদা দাঁড়িয়ে থাকবে গেটের কাছে, কিন্তু কেউ নেই। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পাঁচজন জুলজুল করে দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে গাড়ি আসছে, হর্ন বাজাচ্ছে, গেট খুলে যাচ্ছে, গাড়ি ঢুকে যাচ্ছে, গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাড়ি বেরিয়েও যাচ্ছে। দু একজন পায়ে হেঁটেও ঢুকছে, বড় গেটের কোলে কাটা পাল্লা - সেখান দিয়ে মাথা নীচু করে ঢুকছে। প্রায় আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন গুজগুজিয়ে গালাগাল শুরু হয়ে গেছে তখন কাটা গেটের ফোকর দিয়ে সত্যই বেরিয়ে এলেন বল্টুদা, সকলের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে বললেন - ভেতরে আয়।পাঁচজনে সুট্ সুট্ করে ঢুকে পড়ল।

- একদম কথা বলবি না, বাগানে শুটিং চলছে - ফিস্ ফিস্ করে বললেন বল্টুদা - তোদের ভাগ্যটা খুব ভাল, আজ এলাহি ব্যাপার, এদিকে বাগানে চলছে সিনেমার শুটিং ' মা কেন কাঁদে ' - এইখানে দাঁড়া।

বাগানের একপাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন বল্টুদা। চক্ষু ছানাবড় করে পাঁচজনে দেখতে লাগল গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাকা বাড়ি মাটির বাড়ি, দোকানপাট। এর কোনটা আসল, কোনটা নকল কিছু বুঝতে পারছিল না। এক্কেবারে বেওকুফ বনে গেল পাঁচজনে। সরু লাইন পেতে তার উপরে ট্রলি, ট্রলির ওপর ক্যামেরা, চেঁচিয়ে কে বলল - এ্যাকশন - অমনি ওদিকের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো প্রসেনজিৎ! আহা, চক্ষু সার্থক! তা সেদিন মন ভরিয়ে দিয়েছিল বল্টুদা। এদিকে সিনেমার সুটিং ওদিকে ফ্লোরের ভেতর মেগাসিরিয়ালের, সারাটা দিন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে ভজনবাবু সবান্ধবে তৃপ্ত হলো। বলতেই হলো বল্টুদার হোল্ড আছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞা মতো তারাপীঠে আগমন।এবং এখন দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে ভজনের বুকে ঝড়ের সমুদ্রের মতো উত্তাল ঢেউ দুঃখের! বল্টুদা বার বার বলতে লাগলেন - কি হলো ভজু? শরীর খারাপ লাগছে?

সকলেই বলতে লাগল - কি হলো? কি হলো? ভজু কোনো উত্তর করল না।

রাত্রি বারোটার সময় সকলে হোটেলে ফিরল এবং শয্যাগ্রহণের পূর্বে আর এক প্রস্থ চুমুক পর্বে অশ্রুসিক্ত লোচনে ভজন বলল - জীবনে আমার একটাই চাওয়া বল্টুদা, মেগাসিরিয়ালে নিজের মুখদর্শন, মাত্র একবার দূরদর্শনের বুকে নিজের ছবি দেখতে পেলে জীবন সার্থক, নইলে এ জীবনই বৃথা!

শুনে বল্টুদারতো বটেই, বন্ধুদেরও নেশা ছুটে যাওয়ার উপক্রম। সবাই নিঃশব্দে ভজনবাবুর প্রার্থনা-করুণ মুখ পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

- কিন্তু সে কি করে সম্ভব? - বল্টুদা বললেন - অভিনয় করা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? জীবনে কোনোদিন একটা পদ্য আবৃত্তি করিসনি, আর তুই বলবি ডায়লগ? ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে?

- ডায়লগ চাইনা দাদা, - ভজন একেবারে বল্টুদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল - তুমি আমাকে একটা বোবার পার্ট দিও।

- বোঝো ঠ্যালা, ওর জন্যে আবার বোবার পার্ট তৈরী করতে বলি পরিচালককে! এ্যায় এ্যায়, ওকে বোঝা বোবার পার্ট করা আরও শক্ত।

চার শাকরেদ বল্টুদার পা জড়িয়ে ধরে আরকি! - তুমি মন করলেই হবে বল্টুদা, গুরু লোক তুমি -

- আরে ছাড় ছাড়, আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

- জয় তারা, জয় গুরু - ভজন জয়ধ্বনি করে উঠল।

এদিকে তো বল্টুদার প্রেস্টিজ রাখতে রাতের ঘুম ছুটে যাবার জোগাড়! সহকারী পরিচালক সঞ্জয় বল্টুদা বল্টুদা করে, অগত্যা তাকেই ধরলেন - সঞ্জু, পাড়ার একটা ছেলে খুব ধরেছে, সিরিয়ালে একবার মুখ দেখিয়ে দিতে হবে।

- দা - দা - আ - আ - সঞ্জু চোখ বড় বড় করে ফেলল - তুম্মো এই দলে? বলছিলাম কি আমার তো সর্বত্র যাতায়াত বন্ধ করে দিলেই ভাল হয়! দোকানে যাই, বাজারে যাই, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাই, সবাই খালি বলে - একটু ছোটখাট চান্স করে দাওনা, মুখটা দেখাই!

- হ্যাঁ, তুই একেবারে মস্ত ডাইরেক্টর হয়ে গেছিস!

- আরে, কি বলছ বল্টুদা, পাড়ার মধ্যে যেতে আসতে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলে।

একেবারে খোকা খুকু থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত!
যাঃ শালা, আমি কি নিজের জন্যে বলছি?
- ওই হলো, কত মায়েরা লাইন দিয়ে আসে - আমার ছেলেটা নাটকে অভিনয় করেছে - আরে সেদিন বিয়ে বাড়িতে গেছি, বিয়ের কনে পর্যন্ত বলে বসল।
- বড্ড গুল মারছিস সঞ্জু, দাম বাড়াচ্ছিস।
- মোটেই গুল নয় বল্টুদা, সেদিন বাড়িতে মায়ের গুরুদেব এসেছেন, জটাজুটধারী গেরুয়া বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা, এ্যায়সা ভারী চেহারা, বয়স প্রায় আশি, মায়ের আদেশে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বললেন - কি করছ টরছ? মা বললেন - ওই যে বিখ্যাত মেগাসিরিয়াল - জননী জন্মভূমিশ্চ - ও তো তার এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর।
- বেশ বেশ, - গুরুদেব বললেন - তা তোমাদের সিরিয়ালে সাধুসন্ত গুরুটুরুদেরও সব দেখানো হয়, আমাকে একবার দেখিয়ে দাও না। - বলে হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে উঠলেন।
- মারব এক থাপ্পড় - বল্টুদা হাত তুললেন।
- এক বর্ণ মিথ্যা বলছি না বল্টুদা, মায়ের গুরুর দিব্যি। - না না, বুঝতে পারছিস না - বল্টুদা কাতর গলায় বললেন - এটা একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে আমি পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না। কোনোদিন তোদের এসব বলি? বল?
- আচ্ছা দেখবখন, একটা ভীড়ের সিনে দাঁড় করিয়ে, সেরকম সিন আসুক, বলব তোমায়।

তা দেখতে দেখতে একমাস হয়ে গেল বল্টুদার সত্যিই পাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে পা জড়িয়ে যায়, কখন কার সামনে পড়বেন!

কিন্তু ভজু ছাড়বার পাত্র নয়। দিনে দিনে না পাওয়ার দুঃখ পাহাড় থেকে পর্বতের আকার ধারন করেছে। একদিন সাতসকালে বড় এক চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে এসে হাজির।বল্টুদার মুখ কাচুমাচু, কোনক্রমে ঢোক গিলে বললেন - বলেছি ভজু, হয়ে যাবে ব্যবস্থা, একটা ভীড়ের সিন্ আসুক, দাঁড়

করিয়ে দেবে, বলবে আমায়।

- না না বল্টুদা, ও আমি করব না, যদি দাও তো একজন বড় আর্টিস্টের সঙ্গে একা আমাকে লাগিয়ে দিও, না হলে চাই না - অভিমানে ভজন হন্ হন্ করে চলে গেল। বল্টুদা মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে মা তারাকে ডাকতে লাগলেন।

ভজনের দুঃখ কিংবা বল্টুদার দুশ্চিন্তা কিংবা উভয়ের মিলিত চিত্তশক্তির জোর যাই হোক না কেন মা তারা সমস্যার সমাধান করে দিলেন, একদিন রাতে বল্টুদার সঞ্জু ভাইয়ের ফোন -

- বল্টুদা, আপনার প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা একটা করতেই হলো, আগামী কাল বেলা নটায় আপনার প্রেস্টিজকে নিয়ে চলে আসুন, নটায় অবশ্যই আসবেন কিন্তু, নইলে শুটিং আটকে যাবে।

কিন্তু বল্টুদা খুব উৎসাহিত হলেন না। কোনো ভিড়ের সিনে দাঁড় করাবে হয়ত! ম্যাদামারা গলায় জিজ্ঞেস করলেন - দৃশ্যটা কি?

- একেবারে জমজমাট দৃশ্য বল্টুদা, কোর্ট সিন, বিচারকের ভূমিকায় বিখ্যাত শিল্পী দীপংকর, আর বিচারকের পিছনে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে যে দন্ডধারী সে-ই আপনার ক্যাণ্ডিডেট। চোগা চাপকান পরিহিত, এ্যাই চওড়া কোমর বন্ধনী, রাজা রামমোহন রায়ের ছবির টুপির মতো টুপি, একেবারে রাজকীয় পোষাক বল্টুদা। চুপিচুপি একটা উপদেশ দিই, বরং তুমিই নেমে যাও, দু-তিন দিনের শুটিং, বেশ কিছু টাকাও পেয়ে যাবে।

- হ্যা হ্যা, আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না, কাল তাহলে চলে আসছি।

- হ্যাঁ, নিশ্চয়, দেখো আবার ঝুলিও না যেন, তাহলে আমি ফেঁসে যাবো। বরং আরও দু তিন জনকে এই মওকায় ঢুকিয়ে দিয়ে তোমার প্রেস্টিজটাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে নিতে পারো, কোর্ট সিন তো, জনতার ভীড়ে বসিয়ে দেবো।

আনন্দে বল্টুদার নৃত্য করতে ইচ্ছা করছিল, কোনক্রমে সে ইচ্ছা দমন করে রাত্রেই ছুটলেন ভজুর বাড়ি - ওরে ভজুরে, শোনরে, তোর কি কপাল রে!

সব শুনে ভজু বুঝি সত্যিই মূর্চ্ছা যায়!

- বল্টুদা, ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে থাকতে পারব তো? পা কাঁপবে না তে?

- এ্যাই, এ্যাই ব্যাটা, কি বলছিস কি? আমাকে ফাঁসাবি নাকি?

- না না বল্টুদা, মনে মনে বলব জয় তারা, জয় তারা, জয় তারা -

- সে যা খুশি মনে মনে বলিস, ডায়লগ বলিস না - বল্টুদা বললেন, - তোর চার সাগরেদকে খবর দে, কোর্ট সিনের ভীড়ে ওদের লাগিয়ে দোবো।

- তাই না কি? আ হা হা, একটু পায়ের ধুলো দাও দাদা!

দুদিন নয়, তিন দিন নয়, সেই শুটিং চার দিন পাঁচদিন চলছে তো চলছেই! ভজুর তো ' ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ' অবস্থা। বেচারির রোজ একটু দিবানিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস, এরা তো পেটে ভাত ঠুসে দিয়েই আবার দাঁড় করিয়ে দেয়। এতো কষ্ট হয় ভজুর, সে বর্ণনাতীত। একদিন বল্টুদাকে দেখতে পেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল - ও বল্টুদা, ঢের হয়েছে, আমার ব্যবসা গোল্লায় যাবে, মহা আনন্দে আমার মন কানায় কানায় ভরে গেছে, না না, ভরে গিয়ে উপছে পড়ছে বল্টুদা, এবার ক্ষ্যামা দাও।

- এ্যাই ব্যাটা, শুধু উপছে পড়লে চলবে? সাঁতার কাটতে হবে না?

অবশেষে সাত দিনের দিন মিটল।

অতঃপর দেশের আপামর বাঙালীগণ ভজন দাস মহাশয়কে দূরদর্শনের পর্দায় দেখে চক্ষু সার্থক করলেন, এবং ভজন দাস মহাশয়ের জীবনও সার্থক হলো। পথে ঘাটে দোকানপাটে, টেলিফোনে কতজনের বচনসুধা যে বক্ষ পরিতৃপ্ত করল : তোকে দেখলাম, তোমাকে দেখলাম, আপনাকে দেখলাম - জননী জন্মভূমিশ্চতে - ভজু বিগলিত।

অতঃপর তারপীঠ যাত্রা। এবারের দলে আরও একটি মস্তক যুক্ত হয়েছে - সঞ্জুবাবু। তিনি এবারের মোচ্ছবের প্রধান অতিথি।

বর্যণসিক্ত ভাদ্রমাস, যাত্রী খুবই কম, ট্রেন সাঁইথিয়া পৌঁছাল রাত্রি প্রায় নটায়। কামরা প্রায় খালি হয়ে গেল। অতঃপর ট্রেন ছাড়লে ভজনবাবুর ব্যাগ থেকে বেরোলো কয়েকটি মিনারাল ওয়াটারের বোতল - লিমকা মিশ্রিত ভদকা পূর্ণ। সেই শুর। পরদিন মধ্যরাত্রে মহাশ্মশানে ভজনবাবু যখন যজ্ঞের অনলে মদাহুতি দিচ্ছিলেন তখন তাদের শিরা উপশিরা ধমনীতে রক্তের সঙ্গে মদ্য নয় - সম্ভবত মদ্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।এক গভীর নিনাদ ভজনবাবুর কণ্ঠ হতে নিসৃত হলো - মা, আমার জীবন সার্থক মা, জীবনে আমার

আর কিছু চাওয়ার নেই।...

বাড়ি ফিরলে ভজনবাবুর অর্ধাঙ্গিনী ব্যগ্র হয়ে বললেন - হ্যাঁগো, আমি যে আমার নামে একশ এক টাকার আলাদা পূজো দিতে বলেছিলুম, দিয়েছ তো?

- দিয়েছি তো - বললেন ভজনবাবু, কিন্তু তুমিতো কিছুতেই তোমার মনোবাসনাটার কথা বললে না?

- সে আমি মনে মনে মা কে জানিয়েছি। এখন আর বলতে বাধা নেই। বলেছি

- মা, আমাকে একবার টি.ভি. তে দেখানোর ব্যবস্থা করে দাও মা!

আলুদাসের বোধোদয়

বিকাল থেকে আলুবাবুর মেজাজটা খারাপ্। টেবিলে মা সরস্বতীর ছবি দেওয়া স্যুভেনির পড়ে আছে, সেদিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আর বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাচ্ছেন। স্নেহের ভাগ্নে বিল্টু কখন যে ওটা রেখে গেছে ! কাগজের অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে ওটা দেখলেন আর, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে পাতা উল্টে দেখলেন, হ্যাঁ তাঁর ছড়াটা ছাপা হয়েছে, কিন্তু এটা কি করেছে? দেখেই মেজাজ টং হয়ে গেল।

আলুবাবু ছড়া লেখেন। সন্ধ্যাবেলা আলুবড়া দিয়ে কাঁচালঙ্কা সহযোগে মুড়ি খেতেখেতে ছড়া লেখা তাঁর অভ্যাস।

আলুবাবুর আসল নাম আলাপন সমাদ্দার। পাড়ার লোকে সংক্ষিপ্ত করে আলু–করেছে সেই ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায় নামের এসব বিকৃতি নিয়ে কিছু মনে আসতো না, বড়ো হয়েও না ! বরং এই যুবক বয়সেও এ নিয়ে তিনি বেশ গর্বিতই বলা যায়। কারন তিনি আলুর ভক্ত। নিজেকে গর্বের সঙ্গে বলেন – আলুদাস সমঝদার! মানে নিজের পদবী সমাদ্দার পাল্টে বলেন সমঝদার। আলুভাতে থেকে শুরু করে আলুর নানা পদ তাঁর প্রিয়। সন্ধ্যাবেলা আলুর বড়া দিয়ে মুড়ি খেতে না বসলে তাঁর ছড়া লেখাই হয়না। পৃথিবীর তাবৎ লোক যখন বেগুনীটাই বেশী পছন্দ করে তখন তাঁর আলুবড়াই এক নম্বরে । পত্রপত্রিকায় ছড়া ছাপলে তার হেডিং থাকে – আলুদাসের ছড়া – তার নীচে ছড়ার নাম।

অবশ্য তাঁর জন্য আলুবড়া একটু স্পেশাল! আলুকে জিরে জিরে করে কেটে – এটা তাঁর মায়ের ভাষা = জিরে জিরে করে মানে সরু সরু করে কেটে আরকি – বেসন দিয়ে মেখে বড়া ভাজা। তিনি এটার নাম দিয়েছেন আলুজি। একদিন সন্ধ্যাবেলা ছড়ার ছন্দ মেলাচ্ছিলেন –

বেগুনে বেসন মেখে ভেজে হয় বেগুনী,
আলুকে বেসনে মেখে ভেজে হবে আলুনি?
কিন্তু আলুনি মানে নুন ছাড়া রান্না
তাহলে তো খেতে গিয়ে পেয়ে যাবে কান্না!
তাইতো বাঙালি তার নাম দিলো আলুবড়া
যদিও নামটা মোটে মিঠে নয়, বড় কড়া ।

তা ছড়াটা মেলানো হয়নি শেষও হয়নি। আলুবড়ার একটা ভাল নাম দিতে হবে, যেটা শুনতে ভাল হবে। তারপর সেদিন সন্ধ্যেবেলা আলুবড়ায় কামড় দিয়ে মিলটা মাথায় এসে গেল –

পেঁয়াজ বেসনে মেখে ভেজে হয় পেঁয়াজি
আলুকে বেসনে মেখে ভেজে হবে আলুজি !

নতুন নাম দিয়ে তিনি বেশ সন্তুষ্ট হলেন। নামটা শুনতে ভালই আর বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে।

কদিন ধরে স্নেহের ভাগ্নে বিল্টু ঘ্যানঘ্যান করছিল -

– মামু, আমাদের সরস্বতী পুজোর স্যুভেনিরে একটা ছড়া দিতে হবে।

- ঠিক আছে, দেবখন।

- বেশ হাসির হতে হবে কিন্তু !

- ঠিক আছে।

তা সেদিন ওই ছড়াটাই ওকে দিয়ে দিলেন। সেটা ছাপা হয়ে এসেছে। কিন্তু –

আজ দুপুর থেকে মনটা দমে আছে। একটা কাগজের ছোটদের পত্রিকার তিনি সহ সম্পাদক, সম্পাদক মশাই এমনিতেই তাঁকে কথাবার্তায় একটু দমিয়ে রাখেন। বিশেষতঃ চন্দ্রাবলী যদি সামনে থাকে তাহলে ওনার ভাষণ একটু বেড়েই যায়। এই চন্দ্রাবলী বা সংক্ষেপে চন্দ্রা হল ছোটদের পত্রিকা বিভাগে আরেকজন নবীন কর্মী, সদা চঞ্চলা, সদা হাস্যময়ী, অবশ্যই সুন্দরী যুবতী। ডাকযোগে আসা লেখা ফাইল করে খাতায় লিপিবদ্ধ করা, ইমেলে আসা

লেখাগুলি লিপিবদ্ধ করা, মনোনীত ও অমোননীত লেখা আলাদা করে ফাইল করা, হ্যানত্যান নানা কাজ করে আলাপন বাবুকে সহযোগীতা করে থাকে। সবে মাস তিনেক হলো কাজে যোগ দিয়েছে, আর যেদিন যোগ দিয়ে আলাপনের বাঁদিকের টেবিলে অধিষ্ঠিত হয়েছে সেদিনিই আলাপনের হৃদয়কে কাবু করে দিয়েছে!

তা আজ দুপুরে সম্পাদক মশায় তাঁর নিজের মস্ত টেবিল ছেড়ে আলাপনের টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে এসে বসলেন, হেসে হেসে বললেন – আলাপন, তুমি যে বেশি বেশি আলু খাও বলে গর্ব কর, নিজেকে আলুদাস সমঝদার বল, কিন্তু পুথিবীতে এমন দেশ আছে যেখানের মানুষদের কাছে তুমি আলু খাওয়ায় শিশু – বলে চন্দ্রার দিকে চেয়ে হাসলেন।

দেখেশুনে আলাপনের হাড়পিত্তি জ্বলে গেল, চন্দ্রাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে হ্যাটা করার চেষ্টা! মনের রাগ মনে চেপে বলল -তাই নাকি? কি রকম? আমিতো জানি বাঙালিরাই বেশি আলু ভক্ত, তার মধ্যে আমি আবার সেরা!

- তুমি জান নাকি, চন্দ্রা – আবার চন্দ্রাবলীর দিকে চেয়ে হাসি!

উঃ! আবার আলাপনের গা চিড়বিড়! চুয়ান্ন বছর বয়স পার হয়ে গেছে এখনো -

- না স্যার – চন্দ্রাবলীর গাল গাল হাসি – আমিতো জানি বাঙালীরাই বেশী বেশী আলু খায়। আমার এক সাউথ ইন্ডিয়ান বন্ধু আছে সে বলে – তোমাদের সব কারিতেই আলু!

- আরে ধুর! - সম্পাদক মশাই নাকের কাছে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়লেন – সব শিশু! সব শিশু! আমরা যেমন অনেকটা ভাত খাই তারা তেমন অনেকটা আলুসেদ্ধ মেখে খায়, অবশ্য তাতে একটু এটা ওটা মিশিয়ে নেয়,খাবারের নাম ম্যাশড পোটাটো। তুমি কি এত আলু খাও আলাপন?

- না তা নয়, - আলাপন ঢোক গিলল, মনে হল উনি রসিকতা করছেন।

- বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

- না, মানে

–- আচ্ছা,আলু আমদের দেশে কারা এনেছে জানো? – সম্পাদক সমরেন্দ্র ঘোষাল বিজ্ঞের মতো বললেন - আমাদের দেশীয় আলু হচ্ছে মেটে

আলু যেগুলো বড় বড় ওলের মতো দেখতে ? জানো?

আলুবাবু একেবারে হাঁ ।

- জেনে নাও, আলু আমাদের দেশে এনেছে ওলন্দাজ বা ডাচ রা। ওটা বিদেশী সব্জী। দেশটার নাম নেদারল্যাণ্ডস, ওরা নিজেদের বলে নেদারল্যাণ্ডসে, কিন্তু ইংরেজরা ওদের বলে ডাচ, ভুল বলে, কিন্তু ওই নামটাই সবাই বলে। এনেছে ওরা কিন্তু চাষ শুরু করে ইংরেজরা।

সম্পাদক মশাই জ্ঞান দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন, বললেন – এ মাস থেকে পত্রিকায় ‘ বিচিত্র ‘ বলে একটা পাতা চালু করব ভাবছি, এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখে ফেলো। - বিজয়ী সমরেন্দ্র ঘোষাল ফিরে গেলেন নিজের টেবিলে।

আমাকে ওনার টেবিলে ডেকে বললেই হতো, তা নয়, আমাকে চন্দ্রার সামনে অপদস্ত করার জন্য উজিয়ে এসে আমার টেবিলে বসে চন্দ্রাবলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে - আলুবাবু বেশ দমে গেলেন। তবে অন্য একটা কথা মাথার মধ্যে খোঁচা দিচ্ছে, চন্দ্রার দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু, সেটা আবার কে?

- আপনার ওই দক্ষিন ভারতীয় বন্ধুর নামটা কি? – চন্দ্রার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল আলাপন।

- কেন বলুনতো?

- না, মানে, ওদের ভাষাটা কেমন খটোমটো তো , নামগুলো কিরকম?

- হ্যাঁ, ওদের নামের সঙ্গে নাকি বাবার নাম গ্রামের নাম এসব থাকে, তবে তার সঙ্গে নাম ও থাকে, ওর নাম ভারতী।

যাক, তাহলে মেয়ে বন্ধু – মনে মনে স্বস্তি আলাপনের, কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ের বয়ফ্রেন্ড নেই তাও কি হয়! কি যে হবে! উনত্রিশ বছর বয়স হলো বুকের মধ্যে এমনটা কক্ষনো হয়নি।

-অত ভাবনার কি আছে, - চুপিচুপি বলল চন্দ্রা - আমি নেট সার্চ করে আপনাকে তথ্য দিয়ে দিচ্ছি।

নেট সার্চ ব্যাপারটা কিছুতেই আয়ত্ব করতে পারলাম না - বাড়ি ফেরার সময় মেট্রো রেলে বসে বসে ভাবছিল আলাপন – গুগল খুলে এটা ওটা লিখে

যখনই সার্চ করতে যাই কোথাকার মাল যে কোথায় চলে যায়! যেটা চাই সেটা কিছুতেই আসেনা । কিন্তু এটা কাউকে বলাও যায় না। ওই ম্যাশড পোটাটোর রেসিপি টা কি? - ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শুনল – স্টেশন দমদম, স্টেশন দমদম। শুনেই লাফিয়ে উঠে এর ওর পা মাড়িয়ে নেমে পড়ল। ভাবনার চোটে অগ্রিম ঘোষনা -পরবর্তী স্টেশন দমদম – শুনতেই পায়নি। লোকে তো রেগমেগে গজগজ করতে লাগল। একজন তো – পাগলা কোথায় ছিলি – বলে ঠাট্টা করল।

এরপর বাড়ী ফিরে দেখল স্নেহের ভাগ্নার কীর্তি! তাঁর ছড়াটা ছেপছে, যথারীতি হেডিংও দিয়েছে, কিন্তু আলুদাসের ছড়া না লিখে লিখেছে – আলুদাসের বড়া! ছ্যা ছ্যা ! আমি কি বড়া বিক্রি করি ? মেজাজটা টং হয়ে গেল । মনে হচ্ছিল ভাগ্নার কান দুটোয় আড়াই প্যাঁচ দিয়ে দিই। কিন্তু হাতের কাছে ভাগ্নার কান নেই,তাই নিজের হাত মুচড়েই খান্ত হতে হল।

হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বেরিয়ে পড়তে যাবে মা বলল – চললি কোথায় ? মুড়ি খাবিনা ?

- না – বলে বেরোতে গিয়ে থমকাল, বলল আচ্ছা মা তুমি কি জানো আলু বিদেশ থেকে এনে এদেশে চাষ করা হয়েছে ?

- জানিতো।

- কি করে জানো ?

- পুরী বেড়াতে গিয়েছিলুম, জগন্নাথ দর্শন করিয়ে পাণ্ডা ঠাকুর মন্দিরের রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে গেল, সেখানে দেখি বড় ধড় ওলকচুর মতো সব কাটা হচ্ছে। আমিবললাম এ কি ,ঠাকুরকে কচুর তরকারি দাও ? বলে কি , না মা অলু অছি, এ দিশি অলু, তোমোরা যে অলু খাও ও বিদেশী অলু, প্রভুর ভোগে ওসব চলেনা।

- ও, তাই বুঝি ? আচ্ছা, তুমিতো কত রকমের রান্না জানো, ম্যাসড পোটাটো রাঁধতে জানো? মা সুনয়নী তাঁর সুনয়ন দিয়ে কয়েক সেকেন্ড ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললেন – ও মুখপোড়া! আলু রাঁধতে জানি কিন্তু ইংরেজি আলু

রাঁধতে তো জানিনা, ও তোর বউ এলে রাঁধবে!

সেই ছোট বেলা থেকে বেশি বেশি ভালবাসার সময় মা তাকে মুখপোড়া বলে সম্বোধন করে থাকে। একদিন সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল – বাবা, মুখপোড়া মানে কি? তা বাবা হেসে কুটোপুটি, বললেন – কোন প্রাণীর মুখ পোড়া মতো মনে হয়? তখন সে বুঝেছিল।

- চললি কোথায় ? – মা বললেন।

- দিদির বাড়ি।

দিদির বাড়ি পাশের পাড়ায়, এখনি গিয়ে বিল্টুর কানটা মলতে হবে। দিদির বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে বিলটু একগাল হেসে এগিয়ে এল, বল্‌ল বই পেয়েছ মামা ? এরপর কি আর কানমলা দেওয়া যায় ! হাজার হোক স্নেহের ভাগ্না তো !

- বইয়ের প্রুফ কে দেখেছে ? – গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

- পুরুফ   মানে ? – মামার গম্ভীর মুখ দেখে বিল্টু থতমত।

- মানে বানান টানান কে ঠিক করেছে ?

- কেন ? ছাপাখানার ঘেঁটুবাবু ।

- ছাপাখানাটা কোথায় ?

- এইতো কাছেই।

- চলতো।

- ছড়াটা সবাই খুব ভাল বলছিল মামা –মিনমিনে গলায় মামার মন ভেজাতে চাইল বিলটু, কিন্তু মামা কোন উত্তর দিল না। ছাপাখানায় ঢুকে বিলটু আগেভাগেই এগিয়ে গিয়ে বলল – ঘেঁটুবাবু , আমার মামা এসেছেন, ওই যে বইতে যে ছড়াটা ছাপা হয়েছে সেটা ওনার লেখা।

- আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, এমন একজন লেখকের পায়ের ধূলো পড়ল ! – ঘেঁটুবাবু একেবারে গদগদ – বসুন বসুন , ওরে হরে দাদার জন্য চা নিয়ে আয়, আর আলুর চপ আর মুড়ি, আমিও দাদা আপনার মতো আলুভক্ত, রোজ সন্ধ্যাবেলা আলূর চপ আর মুড়ি না খেলে আমার রাতে ঘুম হয় না।

- প্রুফটা কে দেখেছে ?

- কেন দাদা ? আমি নিজে। খুব যত্ন করে দেখেছি, ছোটদের বই তো ! – ঘেঁটুবাবু কাচুমাচু – কিছু কি ভুল রয়ে গেছে ? – ঘেঁটুবাবু তাড়াতাড়ি কম্পিউটারের আশপাশ ঘেঁটে কতগুলো কাগজ বার করে খুঁজেপেতে আলুবাবুর ছড়াটা বার করে এগিয়ে ধরলেন।

ওটা আর হাতে নিতে হলনা, দূর থেকেই আলুবাবু দেখতে পেলেন নিজের হাতে লেখা পরিস্কার হেডিং – আলুদাসের বড়া।

বড়া খেতে খেতে অবচেতন মনে নিজেই লিখেছে মনের কথা।

আলুরচপ আর মুড়ির ঠোঙা এসে গেছে। করিৎকর্মা হরে চটপট তিনটে ঠোঙা তিনজনকে ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে খেতে খেতে – চা নিয়ে আসছি – বলে বেরিয়ে গেল।

- এমনিই এলাম, আপনার প্রেস দেখতে, - মুড়ি মুখে দিয়ে বলল আলুবাবু – বেশ ভাল কাজ আপনার।

- ধন্য হলাম দাদা !

ফিরতে ফিরতে আলুবাবু অনুধাবন করলেন আলুজি নাম কোন বাঙালী মানবে না। নিজের মনই যখন চাইছে না ! আজকে তিনি সকলের কাছে হেরো হয়ে গেছেন।

না না, একটা লাভ হয়েছে, - ম্যাশড পোটাটো । আলুর এমন বিদেশী পদ, না জানি কতই না মজাদার খেতে! ভাবতে ভাবতে জিভে জল এসে গেল।

আলু কথা

বন্ধুরা,

আলু আমাদের সবার প্রিয় খাদ্য, কিন্তু মা্ত্র চারশ বছর আগে এই ভারতবর্ষে আলুর কথা কেউ জানতোই না। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন কালে প্রথম গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস – ১৭৭২ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত, তিনি ভারতে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্তন করেন। প্রথম চাষ হয় নৈনীতালে। ৭০০০ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে আমেরিকার আন্দিজ অঞ্চলে একধরনের

আলুর প্রচলন ছিল। সেখান থেকে ইউরোপে - - ইত্যাদি ইত্যাদি - - -

লেখাটা কম্পিউটারে টাইপ করে প্রিন্ট নিয়ে চন্দ্রাবলী আলাপনের হাতে দিয়ে বলল –

-আপনার আলু কথা, পড়ে দেখুন, চলবে কিনা।

পড়ে তো আলুবাবু মুগ্ধ! – কি ভাল যে হয়েছে!

– আমার কোন ক্রেডিট নেই, সবই নেট থেকে নেওয়া। তাহলে চলবে বলছেন?

= অত বিনয় করার দরকার নেই।

- তাহলে সম্পাদক মশায়কে দিয়ে আসুন।

-আপনিই দিননা। খেটেখুটে লিখেছেন।

-এঃ! আপনি একেবারেই বুদ্ধু, এই যা, কি বলতে কি বলে ফেললুম, - চন্দ্রা একেবারে অধোবদন।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে, - আলাপন একেবারে বিগলিত।

- বলছি কি, অত উদারতা দেখাবেন না, মনে রাখবেন আমি আপনার সহকারী, এটাই আমার কাজ, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাব কেন।

সম্পাদক মশাই তো পড়ে উচ্ছসিত! টেবিল ছেড়ে উঠে এসে বসলেন আলাপনের সামনে,- এ তো একেবারে নৈনীতাল আলুর জম্পেস আলুরদম হয়েছে! ছাপতে দিয়ে দাও, ছাপতে দিয়ে দাও, আর পরের সংখ্যায় কি নিয়ে লেখা হবে ভাবো। - তারপর চন্দ্রার দিকে ফিরে বললেন – জানো চন্দ্রা, সেই নৈনীতাল আলু খেয়েছি ছেলেবেলায় ! মা রাঁধত আলু দিয়ে মাংসর ঝোল! মাংস ফেলে আলু দাও আলু দাও! এখন আর সে আলু পাওয়া যায় না।এখনকার এই চন্দ্রমুখী! আরে ধুর!

ওই, আবার, - মনে মনে চিড়বিড় করে উঠল আলুবাবু, যত কথা চন্দ্রবলীর সঙ্গে!

-বুঝলে আলাপন - সমরেন্দ্র ঘোষাল খুব আন্তরিক ভাবে বললেন – আমি তো আছি আর ছটা বছর, এই ছবছরে নিজেকে তৈরী করে নাও যাতে অবসর নেবার সময় তোমাকে সম্পাদকের দায়ীত্ব দিয়ে যেতে পারি। তছাড়া, এমন এ্যাসিস্টেন্ট পেয়েছ, খুব কাজের মেয়ে। উইস ইয়োর গুড লাক!

– উঠতে উঠতে বললেন – পরের সাবজেক্ট ভেবে ফেলো।

- কি ব্যাপার! আপনার প্রমোশন লেটার টা তো দেখছি আমিই লিখে দিলুম! – ফিস ফিস করে বলল চন্দ্রা – বলে একগাল হাসল, বলল – আমার কথাটাও মনে রাখবেন।

উত্তরে আলাপন একরাশ কৃতজ্ঞতা দৃষ্টি দিয়ে ছড়িয়ে দিল। চন্দ্রাবলী চোখ নামিয়ে নিল।

-আচ্ছা, ওই ম্যাসড পোটাটোর রেসিপি টা কি? অমন একটা পৃথিবী বিখ্যাত সুস্বাদু খাবার –

-বললে আপনি কি রান্না করবেন?

- তা নয়, তবু জানতে ইচ্ছে করে।

- কাল খাওয়াব – ফিসফিস করে বলল চন্দ্রা।

পরের দিন কাজের ফাঁকে একসময় এদিক ওদিক তাকিয়ে চন্দ্রা বলল – আপনার টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা একটু খুলে রাখুন। আলাপন তাই করে রেখে দেখল চন্দ্রা এদিক ওদিক তাকিয়ে তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট টিফিন কৌটো বার করে ড্রয়ারে রেখে দিল, চুপি চুপি বলল = আপনার ম্যাসড পোট্যাটো।

শুনেই আলুবাবুর মনটা খাই খাই, টিফিন হতে না হতেই নিজের টিফিন বক্স রইল পড়ে আগে চন্দ্রার রাখা টিফিন কৌটো খুলে এক চামচ মুখে দিয়েই চোখটা বুজে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন! আহা! এ জীবনে এত রকম আলুর পদ খাওয়া হলো কিন্তু এমনটি! আহা, মনে হচ্ছে দুধ আর মাখন যুক্ত সাথে একটু আধটু কাঁচা লঙ্কার কুচি!

আলুবাবুর ম্যাসড পোটাটো খাওয়া আড় চোখে দেখতে দেখতে চন্দ্রাবলী খুকখুক করে হাসছিল।

- দারুন! থ্যাঙ্ক য়ু – বিগলিত আলাপন।

টিফিনের সময় অফিস ঘর অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা, মন খুলে কথা বলাই যায়, চন্দ্রা বলল –

– আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে আলুকাবলি, আহা! আমাদের পাশের পাড়া উদাস বাগানের পার্কে আলুকাবলি যা বানায় না! নাম দিয়েছে হুসহাস আলুকাবলি, খেলে মন উদাস হয়ে যাবে।

- তাই নাকি? তাহলেতো একদিন খেতেই হয়।

- গেলেই হয় – চন্দ্রাবলীর প্রশয়।

- আচ্ছা, ওখানে আলু ফুচকা পাওয়া যায়না?

– যায়না আবার, ফুচকা ওলার কাছেই তো আলুকাবলী। ধনেপাতা আর ঝাল ঝাল মসলা দিয়ে তেঁতুল জলটা যা বানায়না!

- আহা! কতদিন যে ফুচকা খাইনি!

– সে কি? কেন?

- ছোট বেলায় অনেক খেয়েছি, কলেজ লাইফেও বন্ধুদের সঙ্গে অনেক খাওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন একা একা, যেখানেই ফুচকাওলা সেখানেই চার পাঁচ জন মেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে, তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়?

– তা সঙ্গে যাবার মতো কেউ নেই বুঝি?

– নাঃ! – গভীর দুঃখ আলাপনের গলায় – ইয়ে, বলছিলাম তাহলে কবে যাওয়া হবে?

– বলব।

তারপর....

একদিন... সন্ধ্যায়....

উদাসবাগানে....

উদাস বাগানে আলু ফুচকা আর হুসহাস আলুকাবলি খেয়ে দুজনে একটা বেঞ্চে বসে জিভে ঝাল আর উদাস বাগানে আলু ফুচকা আর হুসহাস আলুকাবলি খেয়ে দুজনে একটা বেঞ্চে বসে জিভে ঝাল আর টকের মিশ্র ক্রিয়াকলাপের চোটে – হুসহাস – হিহিহিহি – হুসহাস – হাহাহাহা – হুসহাস – ইহিইহি –চলল কতক্ষণ, তারপর দুজনেই চুপচাপ।

- চন্দ্রা

- উঁ

- প্রথম যেদিন তুমি এলে, তোমাকে দেখলাম আর – (কথা নেই) – চন্দ্রা চোখে চোখ রেখে ফিক করে হাসল, বলল – আলুভাতে হয়ে গেলাম! তাইতো?

আলাপন আঘাতে স্প্রিংয়ের মতো উঠে দাঁড়াল।

- কি হলো? বোসোনা, - হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল চন্দ্রা – হিহিহিহি হেসে – আমি সবসময় অতো সিরিয়াস হতে পারিনা!

– আমি জানি - মুখ কালো করে বলল আলাপন – আমি জানি রোজ এরকম কতজন তোমাকে দেখে – (চুপ)

– আলুভাতে হয়ে যায়, কিন্তু তাতে আমার কি? আমার তো আলুভাতে তে চলবে না, আমার চাই ম্যাসড পোট্যাটো।– পরম আদরে আলাপনের বাহু জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাবলী।

স্নিগ্ধ স্নান

চাঁদনি স্টেশনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে টিকিট কেটে পুণরায় সিঁড়ি দিয়ে নামা, তারপর দুপাশে দুই রেললাইন, আমি যখন ভাবছি ডান দিকের লাইনে আসবে টালিগঞ্জের গাড়ি তখন দেখি বাঁদিকে ঝুলন্ত বোর্ডে লেখা - টালিগঞ্জের জন্য ট্রেন।

অবশ্যই ওটা ঠিক, যতই আমার উল্টোটা মনে হোক না কেন। ইতিমধ্যে বাঁদিক আলোয় আলোময়, ট্রেন ঢুকছে, আমাকে উঠতে হবে, যদিও মনে এখনও উল্টো ধন্ধ। ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে যাওয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম - এটা কি দমদমের ট্রেন?

- না না, এটা টালিগঞ্জের - এগিয়ে যেতে যেতে বললেন উনি, আমিও ওনার পিছন পিছন উঠে পড়লাম।

দরজা বন্ধ হলো, ট্রেন চলতে শুরু করল, ঘোষনা - পরবর্তী স্টেশন এসপ্ল্যানেড - তবু আমার মনে হচ্ছে উত্তর দিকেই যাচ্ছি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম অনুভূতিকে দক্ষিণমুখী করে তুলতে কিন্তু হচ্ছে না, আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি - এসপ্ল্যানেড এসে গেল - পুণরায় যাত্রা - আমার চেষ্টা চলছেই - ঘোষনা - পরবর্তী স্টেশন পার্ক স্ট্রীট - আমার প্রাণপণ চেষ্টা - অবশেষে পার্কস্ট্রীট স্টেশনে আমার অনুভব দক্ষিণমুখী হলো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হ্যাঁ, এবার মনে হচ্ছে আমি দক্ষিণে চলেছি - টালিগঞ্জের দিকে।

.... আমি অবন্তীকে বলেছিলাম - অবন্তী, আমি তোমায় ভালবাসি....। আমরা লাইব্রেরীর দিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, সিঁড়িতে শুধুই আমরা দুজন। আমি সামনে ও পিছনে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম - না কেউ নেই, আমি দ্রুত দু ধাপ নেমে অবন্তীর পাশাপাশি। সিঁড়ি যথেষ্ট চওড়া, আমি দুজনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁক রেখে নামছিলাম। এভাবে কয়েক ধাপ পাশাপাশি নেমে ল্যান্ডিং, এবার সিঁড়ি ঘুরে গেছে। ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়েই আমি ডাকলাম - অবন্তী -

ও আমার দিকে তাকাল, আমি বললাম - অবন্তী, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পুরোনো এই দৃশ্য বারবার আমার মনে ফিরে আসে। যখনই আমি একা ভাবনার মাঝে তখনই ওই দৃশ্য...

এ কথার উত্তরে অবন্তী কি বলতে পারত? এই মুহূর্তেটি আমি অনেকদিন অনেক ভাবে মহড়া দিয়েছি - হয়ত ও চোখ নামিয়ে চলে যাবে - কিন্তু -

বই পড়া শেষ হোক বা না হোক আমি রোজ লাইব্রেরি যেতাম। অবন্তী যেদিনই আসুক দেখা হবে। লাইব্রেরিয়ানের সামনে বড় টেবিলের ওপর ফেরত আসা অনেক বই, ওখান থেকে অনেকে বই বেছে নেয়, আমিও অবন্তীর পাশে দাঁড়িয়ে বই বাছতাম। এভাবে বই নাড়াচাড়া করতে করতে আমি লাইব্রেরিয়ান তাপসদার সাথে বিভিন্ন বই সম্পর্কে এটা সেটা আলোচনা করতাম। এভাবে একদিন যেন কথায় কথায় বললাম - এবারের দেশ পত্রিকায় আমার লেখা গল্পটা পড়েছেন?

- না - তাপসদা বললেন।

অবন্তীর দিকে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারলাম ও আমার দিকে একপলক তাকিয়ে পুণরায় বই দেখায় মনোনিবেশ করল। আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল! আমি আমার বিশেষ পরিচয়টা অবন্তীকে জানিয়ে দিতে পেরেছি। আমি এভাবেই আমার প্রতি - ভেবেছিলাম অবন্তীর মনে আমার জন্য স্থান করে নিয়েছি। তাই বলতে পেরেছিলাম - অবন্তী, আমি তোমায় ভালবাসি।

তার পর থেকে আমি আর লাইব্রেরি যাই না। যেতে পারি না। যাবার কথা ভাবলে আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে আসার পদশব্দ শুনতে পাই। আমার নিজেরই সেই পদশব্দ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে, আমার আর লাইব্রেরী যাওয়া হয় না।

পত্রিকা অফিসে আজ আরেকটি গল্প দিতে এসেছিলাম। আজ আবার অবন্তীর কথা বড় বেশী পীড়িত করছে।

ছুটন্ত ট্রেন মানে বাইরে খোলা আকাশ, দারুণ হাওয়া, উথালপাথাল গাছগাছালি। ছুটন্ত ট্রেন মানে পায়ের নীচে নদীর বিস্তার, গমগম বাজনা বাদনরত সেতু যার বাহুগুলি কাটাকুটি খেলে শূণ্যে। ছুটন্ত ট্রেন মানে ছুটে

এসে ছুটে চলে যাওয়া গ্রাম, বালক বালিকা কিংবা গ্রাম্য বধূর কৌতুহলী মুখ।

এ ট্রেনের বাইরে শুধু দেওয়াল দেওয়াল আর আধো অন্ধকার দেওয়াল। আমি চোখ বুজে থাকি। আমার জীবনের চারপাশে নীল আকাশ সবুজ বনের আনন্দগুলি জমাট কংক্রিটের দেওয়ালে ফসিল হয়ে গিয়েছে।

আজ এমিতেও মনটা ভাল নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন হেঁটে আসছিলাম একটা রোগা মত লোক - ময়লা ধুতি আর শার্ট পরা - আমাকে হাত তুলে দাঁড় করালো। আমি ভাবলাম হয়ত বা কেনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু সে বলল - একটা টাকা হবে?

আমি বিরক্ত মুখে ভ্রু কুঁচকে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করলাম। কয়েক পা যাবার পর মনটা কেমন হয়ে গেল, নিজেই নিজেকে বললাম - দিলেই পারতে। পিছন ফিরে দূরত্ব দেখলাম, ভাবলাম ডাকি, কিন্তু পারলাম না। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম হয়ত লোকটা বিড়ি খাবে, কিংবা এভাবে টাকা জোগাড় করে মদ গিলবে... কিন্তু মন মানছে না।

আমি বুঝতে পারি - এভাবে কেউ প্রেম নিবেদন করে না। এভাবে ভালবাসার কথা বলা যয় না। গল্প উপন্যাসে আমি কখনও এমনটা পড়িনি। বাস্তবেও কেউ এরকম বলেছে ও সফল হয়েছে বলে শুনিনি। আলাপ পরিচয়ের পর ধাপে ধাপে ঘনিষ্টতা বাড়লে তবেই -

কিন্তু আমি বলেছিলাম। আমার আবেগ, আমার আকুলতা....

সন্ধ্যাবেলা অভিষেক এসে হাজির। ও যখন আসে হৈ হৈ করে আসে।

- কি ব্যাপার বাবা, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ যে! লাইব্রেরিতে আসছ না। নাকি বিশাল কোনো বই নিয়ে এসেছ যে পনেরো দিন ধরেও শেষ হচ্ছে না? না কি মহাবারত লিখছ না পড়ছ? ও মাসীমা, কি ঠাণ্ডাটা পড়েছে, জমিয়ে এক কাপ চা হবে নাকি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে না কেন বাবা, বোসো।

- যা বলছিলুম - বই না হয় পাল্টাচ্ছিস না, তাহলেও পড়তে পড়তে চোখ ব্যথা,

লিখতে লিখতে আঙুল ব্যথা করলেও তো এক হাত টেবিল টেনিস খেলে মানুষ রিল্যাক্স করে।

লাইব্রেরি দোতলায়। নীচের হলঘরে একটা টেবিল টেনিস একটা ক্যারাম এসব আছে। অভি টেবিল টেনিস খেলতে ভালবাসে, আমি বই পাল্টে নীচে গেলে ওর সঙ্গে খেলি।

- আজকাল কেউ মাইরি আর খেলাধুলোও করে না। সমীরণরা চারজনে তাস পিটতে বসবে তো পিছনে আরও দু-তিন জন হুমড়ি খেয়ে থাকবে তবু একহাত বল পেটাবে না। ওদের ওই ' ট্রাম ' বলে তাসের ওপর তেজ দেখিয়ে যে কি সুখ পায়! আরে বাবা ট্রাম্প করছিস তো একটা কাগজের টুকরো দিয়ে, তাতে অতো গলার জোরে চেঁচিয়ে আার হাতের জোরে পিটিয়ে কি সুখ? হ্যাঁ পিটিয়ে সুখ ব্যাটে বলে!

অভি যখন বকবক শুরু করে তখন তাকে থামাতে যাওয়া বৃথা, আরও চেঁচাবে, তাই চুপচাপ শোনাই ভাল।

মা কফি এনেছে, হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে অভি শুরু করল - আচ্ছা মাসীমা, ও কি লেখাটাকেই জীবিকা করবে?

- তা করুক না, আমি তো বলেছি, লিখবে তো মন দিয়ে ওটাই কর। নিয়ম করে রোজ লিখতে বসতে হবে। তা ও করছেও। লেখা ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছে, আমি পড়ে দেখি।

- কিন্তু এতে কি রোজগার হবে? আজকাল লোকে সেভাবে সাহিত্য পড়েটড়ে বলে তো আমার মনে হয় না। বরং সব সাহিত্য টি.ভি. তে ঢুকে গেছে, লোকে পড়ে না, দেখে।

- তা হোক, তবু কিছু মানুষকে তো চেষ্টা করে যেতেই হবে সৃষ্টির - মা বলে।

অভি যখন ওরকম করে বলে আমার কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে ব্যথা লাগে, কিন্তু ও বলবেই মাঝে মাঝে। কথাগুলো হয়ত সত্যি। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কথা বলে ও, বুঝি, তবু কষ্ট হয়। আমি কি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবই এ কি নিশ্চিত? না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা দখল করে আছে মুষ্টিমেয় দরজাগুলি। বছরে দুএকটা ছোটগল্প বা কবিতা প্রকাশের সুযোগ

কি আর -

এসব কথা আমি যে ভাবি না তা নয়। ভবিষ্যতে সারা জীবন আমি কি করব? কিন্তু মায়ের কথা আমাকে উজ্জীবিত করে। মা যখন এভাবে বলেন, উৎসাহ দেন, আমি আবেগে আনন্দে আপ্লুত হই। মা একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষয়িত্রী। ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনায়াস বিচরণ। বাবা মারা যাবার পর মা আরও বেশি সাহিত্য নির্ভর হয়ে পড়েছেন। তাঁর আশার মর্যাদা দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

- আপনার কথার ওপর কথা বলতে ভয় হয় মাসীমা, তবু আমি বলব লেখাকেই জীবিকা করতে হলে এখনকার দিনে মনে হয় টি.ভি. র দিকে নজর দেওয়া উচিত। কত ভাল ভাল টেলিফিল্ম হচ্ছে, তার গল্প, চিত্রনাট্য এসব লেখার মধ্যে দিয়ে - আর যদি একটা মেগাসিরিয়াল ধরে ফেলা যায় তাহলে তো মাসে কম করে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা আয় করা কোনো ব্যাপার নয়। ওই দিকেই এখন সাবাই ঝুঁকছে। কজন আর সাহিত্য টাহিত্য পড়ে বলুন!

মা হাসলেন। মায়ের অনাবিল হাসি বড় মধুর। কিন্তু কখনো কখনো তার সঙ্গে মিশে যায় ধারাল কি যেন - সমীহ করতেই হয়! মা বললেন - চা খেতে খেতে গল্প করতে করতে কিংবা রাতে আধো ঘুমের মধ্যে দেখা টুকরো টুকরো কিছু দৃশ্য, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন - কে লেখক, কে পরিচালক দেখেও না বা আগ্রহও নেই দর্শকের। বড় জোর অভিনয়ের মানুষদের তবু মনে রাখে, ওরা দর্শক, পাঠক নয় - বলতে বলতে মা চলে গেলেন। অর্থাৎ এ নিয়ে তিনি আর কথা বলতে রাজি নন।

- কদিন ধরে তুই লাইব্রেরিতে আসছিস না - অভি বলল - আগামী রবিবার পিকনিক হচ্ছে। দূরে কোথাও নয়, ওই গড়িয়া পেরিয়ে ওদিকে মন্টুর মামা বাড়ি করেছে, অনেকটা জমি নিয়ে। মন্টু বলছিল গেট দিয় ঢুকে পড়লে বুঝতেই পারবি না কলকাতার এতো কাছে। বাড়ীতে সব আছে, বাসনপত্র থেকে শুরু করে গ্যাস পর্যন্ত। আসলে ওর মামা এখন থাকেন দমদমে, এয়ারপোর্টের কাছে সরকারী ফ্ল্যাটএ। মাসে এক আধদিন আসেন। জয়ন্তর টাটাসুমোতে যাব দশজন। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। তুই শুধু সকাল সাতটায় ট্রামডিপোর

সামনে দাঁড়াবি। ঠিক সাতটায় কিন্তু, দেরী করবি না।

বাড়ি ও বাগান সত্যি সুন্দর! এলোমেলো ভাবে বেড়ে ওঠা নানা গাছ, যদিও ঝোপ জঙ্গলে ভরা নয়। বোঝা যায় নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। অবশ্য বাড়ির সামনের দিকটা সাজানো ফুলগাছটাছ আছে।

সবাই খুব খুশি। হৈচৈ ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল সবাই। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সেই বিষন্নতা কুরে কুরে খেয়ে যায় ঘুণের মতন.... কয়েকটি তীক্ষ শব্দের বাক্য তীর হয়ে বিঁধে আছে.... যন্ত্রণা দেয় সারাক্ষণ...

বিশু আর প্রতীপ রান্নায় দক্ষ। তাদের সঙ্গে ফোড়ন দিতে আছে ধীমান। অর্থাৎ - আগে ওটা দিলি? না না, আগে তেল ঢাল, নুন এখন দিস না - এইসব নির্দেশ আর কি। হাতে যত না কাজ করে মুখের কাজ তত।

- তুই থামবি? - বিশু ধমকায় - যা বলছি কর, ওই লঙ্কা গুঁড়োর প্যাকেটটা দে। আলু আর কড়াইশুটির তরকারিটা হয়ে গেল।

- আরেকটু শুকনো কর না - ধীমান।

- দোবো ছ্যাঁকা - বিশু খুন্তি নিয়ে তেড়ে গেল - কথা না বলে ওই ডেকচিটা দে, তরকারিটা ঢালি।

লুচির ময়দা মাখছে প্রতীপ।

ওদের সঙ্গে মিশে যদি এমন আনন্দ করতে পারতাম! কিন্তু অভি কোথায়? সমীরণ মাছ ধুচ্ছে, ও কে জিজ্ঞেস করলাম।

- কি জানি, ওদিকে ওই গাছতলায় ওরা কি করছে, ওখানে আছে বোধহয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

এখানে একটা ছোট পুকুর। চারপাশে নারকোল গাছ। দুটো নারকোল গাছে নাইলনের দড়ির দোলা টাঙিয়ে তার মধ্যে শুয়ে আছে জয়ন্ত। পাশে মাটিতে মাদুর পেতে বসেছে অভি আর মন্টু। একটা গামলার মধ্যে পেঁয়াজ, শশা, গাজর, টমেটো এসব।

- ভাল করে ধুয়েছিস তো? - বলল অভি।

- হ্যাঁ রে বাবা - মন্টু বলল।

একটা বড় ছুরি নিয়ে স্যালাড কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অভি - আয়, বোস, - আমাকে ডাকল - এই ধনেপাতা গুলো ডাঁটা থেকে ছাড়িয়ে রাখতো।

একটু বেলা বাড়লো। রোদের তাপ সামান্য বেড়েছে। জমে উঠেছে পিকনিক। মাদুরে গুছিয়ে বসেছে অভি, গ্লাসে গ্লাসে ঢালছে। জল মেশানোর দায়ীত্ব মন্টুর।

বন্ধুদের মধ্যেও ঘনিষ্ট, ঘনিষ্টতর, ঘনিষ্টতম - যে যার মতো দল হয়ে গেছে। ওখানে রান্নার জায়গায় বিশু প্রতীপ আর ধীমান, এখানে যেমন আমি অভি মন্টু আর জয়ন্ত, ওখানে পুকুর ঘাটে সন্দীপ ভোলা আর কুনাল। ধীমান মাছ ভাজা দিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে ওদের গ্লাস, পুকুর ঘাট থেকে সন্দীপ এসে নিয়ে যাচ্ছে ওদের পাওনা। জয়ন্ত দোলায় শুয়েই চুমুক দিচ্ছে, হাতে একটা গরগরে ছবির ম্যাগাজিন।

- এ্যায় মন্টু, আমাকে দুটো বাদাম দে তো - বলল জয়ন্ত - মালটা বেশ ভাল রে অভি, দারুণ জমেছে অথচ কিক্ করছে না।

- হঁ হঁ! এর নাম আই বি, একেবারে গোয়েন্দা প্রধান! চুপিসারে ধরে! - কি রে, তোর গ্লাসটা খালি কর - আমাকে বলল অভি - ওই তলানিটা নিয়ে আর কতক্ষণ কাটাবি?

অভি একটা টি.ভি. সিরিয়ালের প্রোডাকশান কন্ট্রোলার। মদ খাওয়াটা ওদের লইনে মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু আমার শখের খাওয়া ক্বচিৎ কখনো - তার ওপর আবার মনটা ভাল নেই, বললাম -এটুকুই থাক, আর চাই না।

- আরে দেবদাস তো আরো বেশি বেশি মদ খায় - অভি বলল, আমি চমকে উঠলাম।

- খা খা - ধমকে উঠল ও, আমি এক চুমুকে তলানিটুকু শেষ করলাম। কিছুই ভাল লাগে না.... তবু করে যেতে হয়.... যে যার কাজে ব্যস্ত.... এমনকি এইসব গাছগাছালি যারা আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, স্থির তারাও ব্যস্ত শিকড়ে বাকলে, পাতায় পাতায়....। রক্তের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ত এ্যালকোহল পৌঁছে যাচ্ছে আপাদমস্তক, ছড়িয়ে দিচ্ছে উত্তাপ ও আবেগ....

অনেকটাই ঢেলে দিলো অভি, মন্টু জল মেশালো।

- খা খা, - বিড়বিড় করে বলল অভি - তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, আমি জানি। গ্লাস নিয়ে লিখতে বসবি আর সিগারেট নিভতে দিবি না, দেখবি লেখা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসবে। দ্যাখ না, আমাদের এই মেগাসিরিয়ালটা, রোজ গল্প বানানো হয়। যে ভদ্রলোক চিত্রনাট্য লেখেন তিনি জীবনে কোনোদিন গল্প লেখেননি। পরিচালক আর চিত্রনাট্যকার দুজনে মিলে পরের দিনের শুটিং এ কি ঘটনা থাকবে তার কাঠামো ঠিক করে, তারপর চিত্রনাট্যকার হু হু করে সংলাপ লিখে চলেন। পুড়ে যায় প্যাকেটের পর প্যাকেট দিগারেট.... মাসে কত ইনকাম জানিস? তিরিশ হাজার টাকা। - এত কথা একসঙ্গে বলে গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিলো অভি।

- আরি বাস! তাই নাকি? - জয়ন্ত বলল - আর লেখার সময় সামনে যদি এরকম নায়িকার ছবি রাখা যায়?

- দারুণ, দারুণ - বলে উঠল মন্টু - দেখি দেখি - হাত বাড়াল।

- উঁহুঁ, দূর থেকেই দেখ বাছা, এ এখন আমার বুকের জিনিস - খোলা বইটা বুকের ওপর চেপে ধরল জয়ন্ত।

- হ্যাঁরে অভি, ওটার কি হয়েছে বলত? অমন নেতিয়ে গেছে কেন? - হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় একটা খোঁচা দিল জয়ন্ত।

- বোধ হয় প্রেমে পড়েছে - বলল অভি।

- ধুস্ শালা, প্রেমে পড়লে তো মানুষ চনমনে হয়। এই দ্যাখ না আমাকে, রোজ খুব কম করে হলেও দু-তিন জনের প্রেমে পড়ি। রাস্তাঘাটে, বাসে ট্রামে। এইতো এখন এই বইটায় যতগুলো মেয়ের ছবি আছে সবাইয়ের প্রেমে পড়ে মাতাল হয়ে গেছি।

- ও তো সব তোর দেখন প্রেম। ধরা নয়, ছোঁয়া নয়, কথা নয়, শোওয়া নয় - মন্টু বলল।

- বাঃ বাঃ! বেশতো কবিতা বললি! ধরা নয়, ছোঁয়া নয়, কথা নয়, শোওয়া নয়! বাঃ! - জয়ন্ত বলল - বাবা যখন গাড়ি কিনব বলল তখন এত আনন্দ হয়েছিল! ভেবেছিলাম ছিপছিপে মারুতি কিনবে, রাস্তা দিয়ে যখন ভেসে ভেসে চলে যাব কত মেয়ে তাকাবে। একে তুলব, তাকে তুলব, তা কি বা কিনল সুমো, বলে কি

না ফ্যামিলির জন্যে। সুমো চালিয়ে গেলে কেউ দেখে না রে, হয়ত ভাবে ড্রাইভার। তার চেয়ে মোটর বাইক ভাল। ভাবছি তাই কিনব - দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়ন্ত, বলল - দে, আরেকটু দে - বলে হাত বাড়াল, কিন্তু গ্লাসটা ঠক করে মাটিতে পড়ে গেল।

- ব্যস, ব্যস, আর না, বুঝলাম তোর ঘন্টা বেজে গেছে - বলল অভি - এর পর খেলে মৌজ নষ্ট, শুধুই কষ্ট, তাছাড়া বোতলও খালি।

-ওঃ, আজকে সবাই শা কবি হয়ে গেছে! - মৌজ নষ্ট, শুধুই কষ্ট! কিন্তু তোমার স্টকে আরেকটা বোতল আছে, জানি না ভাবছ? আমার কষ্ট আমি বুঝব। এখন আমি আধুনিক কবিতা বলছি শোন, তোমাদের মতো মিল দিতে পারব না।

- ওরে জয়ন্তকে কাগজ কমল দে, কবিতা লিখবে -

- ওই দেখ তোর কথা উল্টে যাচ্ছে, - জয়ন্ত বলল - কলম কে কমল বলছিস -

- কক্ষোনো না, আমি কমল বলেছি -

- ওই দেখ, আবার কমল বলছিস -

আমি ও অভি হেসে উঠলাম।

- ওইসব হেসে ফেসে আসল ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবার মতলব - বলল জয়ন্ত - বোতলের ভেতর বন্দী আছে দৈত্য, ওকে মুক্তি দাও। তাহলে কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে ও আমাদের এনে দেবে আনন্দের মোহমুদ্গার -

- মোহমুদ্গার? সেটা আবার কি জিনিস? - বলল মন্টু।

- আধুনিক কবিতায় ওরকম দু-একটা শব্দ জুড়ে দিতে হয়।

- কি জ্বালা মাইরি - জয়ন্ত অস্থির ।

- ঠিক আছে, আমারটা নে - আমার গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতে গেলাম আমি।

- ওটা তো তুই খাবি - ভীষণ ধমকে চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল অভি, ওর মুখ রাগে থমথমে। ওপাশে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে সমীরণ।

- এসব ছেনালীপনা আমার একদম সহ্য হয় না - আবার চিৎকার উঠল অভি - একটা মেয়েছেলে মুখে ইয়ে করে যাবে আর তাই নিয়ে হাহুতোশ, ন্যাকামি! – মাটিতে পড়ে থাকা গ্লাসটায় এক লাথি মারল অভি, সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল।

- এইরে, ব্যাটা খেপে গেল কেন হঠাৎ? - জয়ন্ত দোলা থেকে নেমে পড়ল - মেজাজটা মাটি হয়ে যাবে, পালাই - বলতে বলতে জয়ন্ত চলল বিশুদের দিকে, মন্টুও এর মুখ ওর মুখ দেখে নিয়ে জয়ন্তকে অনুসরণ করল।

আমার ঝিমুনি ছিটকে গেছে, ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালাম, অভি কি আমাকে চাবুক মারল?

- আমি সব শুনেছি, বলে কিনা আপনার সাহস তো কম নয়! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! - বলল অভি, থুঃ করে শব্দ করল।

- কিন্তু কিন্তু - আমি হতবাক।

- আমি তখন সিঁড়ির তলায়, টেবিল টেনিসের বলটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল দরজা দিয়ে, ঢুকেছিল সিঁড়ির তলায়, আমি খুঁজছিলাম।

শান্ত হয়ে বসে পড়ল অভি, আমিও বসলাম, মাথা নীচু করে।

- এই যে তোর মন মরা ভাব এটা প্রেম ভালবাসার জন্য নয় - অভি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল - এসব আমি খুব বুঝি, ওই অপমানটা তোকে খুব লেগেছে, ওই কথাগুলো ময়লার মতো লেগে আছে গায়ে।

- তাই কি? - আমি মনে মনে বললাম - বোধহয় তাই।

- কি মনে হয় তোর?

- বোধহয় তাই।

- বোধহয় নয়, ঠিক তাই, আর ময়লা গায়ে লাগলে মানুষ কি করে?

আমি কি মৃতের চোখ নিয়ে অভির দিকে তাকালাম?

- ধুয়ে ফেলে, ময়লা ধুয়ে ফেলে - অভি বলল - ওই ময়লা তোকে ধুয়ে ফেলতে হবে। একটা হালকা মনের মেয়ে, ও কি বুঝবে তোর মর্যাদা? লাইব্রেরী থেকে ও যে বই নিয়ে যায় তুই কি ভাবিস ও পড়ে? ছাই, পড়েওর ঠাকুমা। ও সারাক্ষণ টি.ভি. খুলে দেখে শুধু শেক্সি নাচ। ওর এক মাসতুতো দাদা আছে, মারুতি গাড়ি নিয়ে আসে, তার সঙ্গে হোটেলবাজি করে বেড়ায়।

- থাম অভি - কাতর গলায় বললাম আমি।

- আমার থামা না থামায় কিছু এসে যায় না, কিন্তু নিজেকে অমন গাড্ডায় ফেলে ডুবে যাস না, তোর চরম ক্ষতিহয়ে যাবে।

তোর মা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। ধুয়ে ফেল, ময়লা ধুয়ে ফেল।

.... হয়ত অভি যা বলছে সেটা সত্যি, হয়ত নয়, শুধু আমার মন ফেরানোর জন্য বানিয়ে বলছে। আমি গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে ফেললাম। অভি একটা কথা অন্ততঃ আমায় ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছে, যেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না - অবন্তীর অপমানকর কথাগুলো আমাকে জর্জরিত করছে সারাক্ষণ, প্রত্যাখ্যান ততটা নয়।

- কাল তেইশে জানুয়ারির ছুটি, আমার শুটিং নেই, কালকে আমি একটা লোকেশান দেখতে যাবো, বেশি দূরে নয়, ওই বর্ধমান কর্ড লাইনে, হাওড়া থেকে মিনিট চল্লিশ, তুই আমার সঙ্গে যাবি।দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরুবো।

ট্রেন চলে গেলে স্টেশন বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ধান কেটে নেওয়া শূণ্য প্রান্তরের মাঝ দিয়ে সোজা ছুটে চলে গেছে রেলপথ, ওই দূরে বিলীয়মান বিন্দুর দিকে তাকালে দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। প্লাটফরমের শেষে বেঞ্চে বসে রোদ পোহাচ্ছে তিন বৃদ্ধ। কেমন শান্ত জীবন ও চরাচর। ঢালু প্রান্ত বেয়ে দুজনে নেমে এলাম।

দুপাশে গাছের সারি নিয়ে পথ চলে গেছে সোজা। দুই নারীপুরুষ কথা বলতে বলতে ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছে, তাদের কথাবার্তার শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল, তারপর সব সুনসান। দুপুর গড়িয়ে গেছে, রোদ্দুর একেবারেই তেজহীন। আমরা চুপচাপ হাঁটছিলাম।

মিনিট পনেরো হেঁটে আমরা মোটামুটি ঘনবসতি একটা গ্রামে পৌঁছলাম। পুরোনো আমলের পাকা বাড়ি সব, মাঝে মাঝে দু-একটা আধুনিক ডিজাইনের নতুন বাড়িও হয়েছে, আবার মাটির বাড়িও আছে। হাঁটতে হাঁটতে অভি যে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল সেটা একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি, বন্ধ বিরাট সদর দরজা, ওপরে তাকালে রেলিং দেওয়া দীর্ঘ বারান্দা। থাম, খিলান, কারুকার্য, বারান্দার রেলিং, দরজা জানালার গঠন - সব মিলে মনে হয় শতাব্দী থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি অক্ষত বাড়িটা, যদিও রঙের প্রলেপ পড়েনি বহুদিন।

এতক্ষণে অভি কথা বলল। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল - বাড়ির সামনেটা রঙ করে নিতে হবে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল - কি মনে হয়? রঙ করে ফেললে একশ বছর আগেকার জমিদার বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যাবে না?

একটা ক্ষীণ শব্দের গান ভেসে আসছে, আমি কান পাতলাম, হ্যাঁ, - শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির ওই ডালে ডালে - সঙ্গে ধুপ ধুপ তালের শব্দও হালকা শোনা যাচ্ছে।

- কে যেন গান গাইছে - আমি বললাম।

- হুঁ - বলে অভি এগিয়ে গেল।

সদর দরজার বাঁদিকের পাল্লায় আবার একটা ছোট পাল্লা। কে জানে এটাকে কি বলে! সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। নীচু হয়ে ঢুকল অভি, বলল - আয় - আমিও ঢুকলাম। দুজনে দাঁড়ালাম। সামনে বিরাট উঠোন। একেই বোধহয় বলে প্রাঙ্গণ! প্রাঙ্গণের প্রান্তে ঠাকুর দালান, সেখানে কোমরে আঁচল জড়িয়ে দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী, সামনে জনা পনেরো বালিকা তিন চার সারিতে নৃত্যরতা। সম্ভবত নাচ শেখানো চলছে বা মহড়া।

আমরা এগিয়ে গেলাম। বালিকাদের ছন্দপতন, কারণ ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। দিদিমনির বিরক্তি এবং ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকানো ও কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামতে নামতে উচ্ছসিতা - কি রে দাদা! - তারপর অপরিচিত আমাকে দাদার পিছনে দেখে সহসা শান্ত - এসব ঘটে যায় কয়েক মুহূর্তে। নাচের পরিশ্রমে এই শীতেও তার মুখ ঘাম তেল মাখানো দেবী প্রতিমার মতন।

যুবতী কোমরের আঁচল খুলে মুখ মোছে। আমার মনে হলে না মুছলেই হতো। কিন্তু মুখ মুছে দেবী মানবী হলেন।

- এ আমার বন্ধু, পরিচয় পরে দিচ্ছি, আগে রোদ থাকতে থাকতে বাড়িটার কটা ছবি তুলে নিই আয় - বলতে বলতে অভি ওর ঝোলা ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে এগিয়ে গেল, আমি পিছনে, আমার পিছনে দেবী অথবা মানবী।

- বাড়ির ছবি তুলবি কেনরে দাদা - অবাক হয়ে বলল ও। অভি ততক্ষণে

বাড়ির সামনের অনেকটা খোলা জমিতে এগিয়ে পিছিয়ে এ কোন ও কোন থেকে একের পর এক ছবি নিচ্ছে। তারপর আবার উঠোনে ঢুকে উঠোন, ঠাকুর দালান ঘর এসবের ছবি নেওয়া, তারপর চল দোতলার বারান্দায় - আমরাও ছুটলাম - দোতলার বারান্দা থেকে ঠাকুর দালান উঠোন এসব ছবি, তারপর চল ছাদে যাই - আবার ছুট -

ছাদ যেন খেলার মাঠ! সেখানেও কিছু ছবি নিয়ে থামল অভি।

- বাবাঃ! হাঁফিয়ে গেছি, কিন্তু বাড়ির এত ছবি তুলছিস লেন?

- কেন আবার, এমনি - ক্যামেরা বন্ধ করতে করতে বলল অভি।

- হ্যাঁ, এবার পরিচয় করিয়ে দিই - এ আমার বোন অলকানন্দা, এটা আমার মামার বাড়ি। ও রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী, এবার এম. এ. দেবে। এসব কচি কাঁচাদের নিয়ে নাচ গান আবৃত্তি শেখায়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন আছে। ওদের বার্ষিক উৎসবে একটা স্মরণী প্রকাশ করে, নামী অনামী কবিদের বেশ কিছু কবিতা ছাপায়। কিছুদিন আগে তোর থেকে একটা কবিতা নিয়েছিলাম, ওর জন্য। - তারপর ওর দিকে তাকিয়ে - অলকা, এই সেই কবি -

কেমন স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে যায় অলকানন্দার মুখ, কোন সুদূরে যেন দৃষ্টি ভাসিয়ে অনুচ্চ স্বরে আবৃত্তি করে ও -

যে যেখানে থাকো যেন চিঠি দিও / দ্যাখো আমার চারপাশে কোনো বৃক্ষ নেই ছায়া দিতে / কিংবা কাছাকাছি কোনও নদী / যার কাছে পায়ে পায়ে হেঁটে গেলে / পেয়ে যাবো স্নিগ্ধ স্নান..../ যে যেখানে থাকো কেন চিঠি দিও.... বনভূমি, সমুর পর্বত....

প্রতিটি শব্দের সাথে কি ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ.... সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে আমার শিরায় শিরায় স্নায়ুতে... এমন করে মুখেমুখি কখনও শুনিনি নিজের রচনা। এই তুচ্ছ রচনাও বুঝি মহার্ঘ সৃষ্টি হয়ে উঠল অলকানন্দার ওষ্ঠে।

কবিতা শেষ করে ও বলল - ঠিক হয়েছে আবৃত্তি?

- কি বলব, আমি ধন্য - প্রায় জড়িত কণ্ঠে বললাম আমি। খোলা ছাদে বাতাস বইছে, এই শীতে কি এলো বসন্তের দখিনা বাতাস! অলকানন্দার চুল উড়ে

পড়ছে মুখের ওপর, ছুটোছুটিতে কখন খুলে গেছে ওর এলো খোঁপা।

- কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকায় আপনার গল্প পড়েছি, ভালো।

আহ্! মনে হচ্ছে পায়ে পায়ে আমি পৌঁছে গেছি ঈপ্সিত নদীর কাছে....স্নিগ্ধ স্নান...

কুকুরীর সঙ্গে আলাপ

তোর জন্য তো রোজ একটা রুটি বরাদ্দ করে ফেলতে হলো দেখছি! সেই এপাড়ায় আসার পর প্রথম যেদিন রাত্তিরে রুটি মাংস কিনে ফিরছিলাম - পিছু পিছু লেজ নাড়তে নাড়তে আসছিলি - সেইটাইতো রোজের রুটিন হয়ে গেল রে! আসলে প্রথম দিনের খাওয়াটাই লোভ ধরিয়ে দিয়েছে। মাংসের হাড় আর ঝোল মাখানো রুটি! তা ভালোই হলো একরকম, এখানে আমার কেউতো সঙ্গী নেই, অন্ততঃ তুই মাঝরাত্তিরে গলির মুখ থেকে এই শেষ পর্যন্ত অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসিস, আমার খাওয়ার সময় জানলার বাইরে বসে খাওয়ার তদারকি করিস। বেশ, বেশ! শুধু তাই কেন, যখন অফিস বের হই তখন দরজা দিয়ে বেরোতে না বেরোতে পায়ের কাছে এসে কাঁই কুঁই করে ভালবাসা জানাস, পরম সমাদরে লেজ নাড়তে নাড়তে গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিস।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম কুকুরের মতো প্রভুভক্ত জীব পৃথিবীতে আর নেই। ওই যে ইংরেজি গল্প পড়েছিলাম - রাজা ওডিসিউস ট্রয়ের যুদ্ধ শেষে দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশে কাটিয়ে ফিরেছিলেন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে, কেউ তাকে চিনতে পারেনি, এমনকি স্ত্রীও, কিন্তু তাঁর পোষা কুকুর ঠিক চিনতে পেরেছিল।

তোর একটা নাম দেওয়া উচিত। বেশ আহামরি নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, অতো কাঁই কুঁই করতে হবে না, এইনে রুটি খা। আজ থেকে তোর নাম দিলাম মিলি। কী, পছন্দ হয়েছে তো? বেশ বেশ!

বুঝলি মিলি, তোদের এই ছোট গলিটা ভালই। কটামাত্র বাড়ির পরেই শেষ, তারপর রেলের পাঁচিল, ওপাশে রেললাইনে রেলগাড়ীর ছোটাছুটি। বন্ধ গলি, তাই অনবরত লোকের যাতায়াত নেই, আর এই শেষ প্রান্তের বাড়িটাতে তো আমার বাড়িওয়ালা - বুড়োবুড়ি ওরা, আর আমি ছাড়া আসার কেউ নেই। তাও আবার বুড়ি দোতলা থেকে নামেন না, বুড়োবাবু যা বাজার টাজার যায়। অবশ্য তুই এখন আসছিস।

একটা ঘরের এই ফ্ল্যাটটা বিজ্ঞাপন দেখে যেদিন দেখতে এসেছিলাম সেদিন ওই রেলগাড়ির আওয়াজের কথা জানতাম না। বিজ্ঞাপনে তো আর

ওসব কথা লেখা থাকে না! তবে বাড়িওয়ালা বললেন - রাত সাড়ে এগারোটায় শেষ গাড়ি চলে যায়। তা আমারওতো ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে যাবে, খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুতে শুতে শেষ গাড়ি চলেই যাবে। আওয়াজের কথা ভেবে প্রথমে মনটা খুঁত খুঁত করছিল তবু অতসব না ভেবে ফ্ল্যাটটা কিনেই ফেললাম। অন্য সুবিধা গুলোও তো দেখতে হবে। এখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমার অতীত জানে না, আর এই ছোট গলি, অল্প লোকজন, শেষ প্রান্তে কারো আনাগোনা নেই। সবচেয়ে বড় কথা স্টেশনটা কাছেই। এই দূর মফঃস্বলে নিজেকে আড়ালে রাখার এমন জায়গা আর আমি কোথায় পাব। তাছাড়া লাভও হয়েছে, কলকাতার ওই বড় ফ্ল্যাট বিক্রি করে তার অল্প কিছু টাকাতেই এটা কেনা হয়ে গেল। সঞ্চয় বেড়ে গেল। অবশ্য ফ্রিজ, স্টিল আলমারি, একটা চেয়ার আর টেবিল ছাড়া সব বিক্রি করে দিতে হলো। এখানে ওসব শোকেশ, ড্রেসিং টেবিল, ছয় চেয়ারের ডাইনিং টেবিল আর অতবড় ঢাউস খাট - থাকবে কোথায়, আর দরকারই বা কি? শুধু এই বইগুলো নিয়েই হয়েছে মুশকিল, খাটের তলায় জড়ো করে রাখতে হয়েছে। এটা একটা ছোট খাট। এখন এই ছোট ঘর, ছোট খাট, লেখাপড়ার টেবিল, খাওয়ার টেবিল, ছোট্ট রান্নাঘর, এইসব ছোটখাটো জিনিসের মালিক আমি।

কি হলো? অত ছটফট করছিস কেন? আরে খাবি খাবি! একটা রুটি তোর জন্য বরাদ্দ করে ফেলেছি, কিন্তু এমন মাগনার ভোজ খেতে গেলে একটু ঢপের কেত্তন তো শুনতে হবে না? যদি বসতে না ভাল লাগে তাহলে রাস্তায় একটু পায়চারি করতে করতে শোন। কেঁউ কেঁউ করে লাভ কি? ওসব কান্নাকাটিকে লোকে এখন নাটক ভাবে। বাস্তবে ওসবের কোনো দাম নেই। এইতো, দেখনা, ওপরের বুড়ো বুড়ি - ওনাদের নাকি এক ছেলে, তা সেই ছেলে নাকি অফিসের সুবিধের জন্যে কলকাতায় থাকে। হ্যাঁ, বউ নিয়ে। সেজন্যই ওনারা নীচের এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিলেন। এসব কথার আড়ালে শুনতে পাচ্ছিলাম একটা কান্না। কিন্তু শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। মানে বিদ্রুপের হাসি! আরে বাবা এটাতো একেবারে একশ শতাংশ সত্যি কথা - সবাই যা করছে - বিয়ে করে বউ নিয়ে টুক করে খসে পড়ছে! সেটাকে লুকোছাপা করে সুন্দর করে প্রলেপ

দিয়ে লাভ কি? সবাই আসল কথাটা বুঝে যাবে, শুনতে পাবে কান্না।

তোকে চুপিচুপি বলি, আমিও তাই করেছিলাম। দ্যাখনা, প্রথমেই বউ কাঁধ পর্যন্ত চুল কেটে শ্যাম্পু দিয়ে হাত কাটা ম্যাক্সি পরে ফুরফুর করে ঘুরবে - এটা কি একসঙ্গে থাকলে হবে? কিংবা হাফপ্যান্ট-বারমুডা আর গেঞ্জি? সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়ে রাতের ডিনার হোটেলে খেয়ে বাড়ি ফেরা, কিংবা বাথরুমে একসঙ্গে স্নান - নাঃ, তোর দেখছি বড্ড খিদে, অত কিঁউ কিঁউ করছিস কেন? দাঁড়া, গ্লাসেএকটু ড্রিংক ঢেলে নিই, ফ্রিজ থেকে একটু বরফ আনি -

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল, একটা চুমুক দিয়ে এবার একটু ঠিক হলো। আর একটু বোস, গেলাসটা শেষ করেই খেতে বসব। ততক্ষণ আরেকটু ধৈর্য ধর।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম - একসঙ্গে থাকলে বড় বাঁধা ধরায় চলতে হয়, যেমন ধর - বন্ধু বান্ধব আসবে, পাঁচ রকমের স্ন্যাকস্ সাজান হবে টেবিলে - চিকেন পকোড়া, স্যালাড - মেজাজে পান ভোজন - এ তো অসম্ভব! আবার এই আসরে সেজেগুজে এসে বসবে সহধর্মিনী - তবেই তো সহধর্মিনী! আমার সেই শ্রীরামপুরের বাড়ীতে বাবা মা দাদা বৌদি ভাইপো ভাইঝি, আবার কোনদিন এলো পিসিরা বা কোনদিন মাসিরা, আবার বড় মামা এলো তো একেবারে হাট্টিমাটিম্ টিম্! এসব কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম বলেই না নিজেদের ইচ্ছে মতো লাইফ এনজয় করতে পেরেছি। তবে কি না এখন - নাঃ, তোর দেখি আর সহ্য হচ্ছে না! দাঁড়া খাবারটা সাজিয়ে নিই। তোর রুটিটা কি একটু হুইস্কিতে ভিজিয়ে দোবো? আজ তড়কা রুটি এনেছি।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে - বিয়ের পর কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে বউকে নিয়ে আলাদা হলাম। শরীরের অলিন্দে অলিন্দে তুরীয় অবস্থায় বিচরণ করে আর মাঝে মাঝে বেড়িয়ে এসে বছর দুয়েক কেটে গেল হুস্ করে, তারপরই ধীরে ধীরে কেমন যেন সব ঝিমিয়ে যেতে লাগল, বুঝলি? ও, - ধর ওর নাম - পি - সারা দিন শুয়ে বসে সময় কাটে না ওর, আমার মিডিয়ার

চাকরি, অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরিই হয়, তারপর খাওয়া শোওয়া, ছুটির দিনেও সেই দুজনে - কেমন একঘেয়ে লাগে। বেলুন যেন চুপসে যেতে লাগল। অতঃপর এক ছুটির দিন সন্ধ্যায় আমি কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলাম। আমার ছয় চেয়ারের ডাইনিং টেবিলে একটা অতিরিক্ত চেয়ার জুড়তে হলো, আমার পি বসল তাতে, জমে গেল ব্যাপারটা। টেবিলের ছয় চেয়ারে দুজন মহিলা, ওরা আমার ' অফিস কলিগ '। মহিলারা প্রথম প্রথম - না, না, - তারপর - আচ্ছা একটুখানি - এভাবে অনিচ্ছায় পান করল, অবশ্যই কোল্ড ড্রিঙ্ক মিশিয়ে। আমার ফ্ল্যাট থেকে বাইপাশের দূরত্ব সামান্যই, ওখানে দুর্দান্ত সব রেস্টুরেন্ট হয়েছে, ফোন করলে দশ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে যায় - যেমনটি পছন্দ। স্ন্যাকস্ থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, এমনকি স্যালাড পর্যন্ত।

আমাদের শ্রীরামপুরের বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখি রান্নাঘরেই চলে ধুন্ধুমার! গাদা গাদা বাজার করে আনছে পুরুষরা আর মেয়েরা ঘেমে ঘেমে রান্নাঘরে যুদ্ধ করছে। এর ওপর লোকজন এলে তো আর কথাই নেই! তখন দশবার ধরে বাজার যাও, এটা আনো, সেটা আনো, উঃ! বাপরে বাপ। বাজার করা আর রান্নাকরার মধ্যে ওদের মোক্ষলাভ! পারেও বটে! বাজার করে এনে কি আত্মপ্রসাদ! এ রকম মাছ, ও রকম সব্জি, সে রকম মাংস - যেন ওরাই সেরাটা চেনে। আবার রান্নাঘরের ওদের কি অহংকার! - এই মাছের পদ, ওই মাংসের পদ, এমনকি আলুর দম বানিয়েও কি গর্ব!

আচ্ছা মিলি, তোর এই দাঁত বার করে হ্যা হ্যা করা এটা কি হাসি না ভ্যাংচানি? দেখিস বাপু, ভ্যাংচাস না - মানে বিদ্রুপ করিস না। তোকে একদিন ভদকা খাওয়াব, মেয়েরা ভদকা খায় - লিমকা মিশিয়ে। তুই তো মহিলা রে!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, লোকজন বাড়িতে আসবে আর বাড়ির মহিলা তাদের জন্য রান্নাঘরে ঘেমে নেয়ে খাবার বানাবে এটা বিশ্রী ব্যাপার। এই হোম ডেলিভারি আজকাল খুবই ভাল ব্যবস্থা। আমরা তো রোজ দুপুরের খাবার রাতের খাবারও হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। ভালই খাবার দিত রে। একেবারে ঘরোয়া। আবার মাঝে মাঝে স্পেশালও দিতো। কিন্তু এভাবে

চলতে চলতে মুশকিলটা হলো কি কোনে কাজ না থাকায় পি আমার হাঁফিয়ে উঠল। তা বলে রান্নাটান্নায় ব্যস্ত হতে চাইল তা নয়, এই কিছু একটা যদি করা যেত - চাকরি বাকরি।

মাঝে মাঝেই আসর বসছিল, আর সে আসরে আলোচনার মধ্যে এ ব্যাপাটাও চলে আসত, আর সকলে একমত হতো যে পি-র একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু শুধু বি. এ. পাশ সার্টিফিকেট নিয়ে কি করা যেতে পারে? আমি অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলাম না -

কি হলো? আবার হ্যা হ্যা করছিস? ওটা কি তোর খিদের ভাব প্রকাশ, না কি আমাকে বিদ্রুপ করছিস?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পি যথেষ্ট সুন্দরী, আর তাই আমি উৎসাহী না হলেও -

সাত চেয়ারের ডাইনিং টেবিলে দুটি চেয়ার প্রায়ই খালি থাকছিল - অর্থাৎ মহিলা দুজনের অনুপস্থিতি বেড়েই যাচ্ছিল। বদলে বেড়ে গিয়েছিল আর একজন পুরুষ, অতএব ছয় চেয়ারই পূর্ণ। পঞ্চপুরুষ বেষ্ঠিত হয়ে আমার পি মধ্যমণি! আসলে পি এর প্রতি পুরুষদের মনোযোগ বেশি হয়ে যাওয়াই হয়ত মহিলাদের অনুপস্থিতির কারণ। আমি ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিলাম। একটু বৈচিত্র আরকি! সব মানুষই বোধহয় বৈচিত্র চায় - সব কিছুর মধ্যেই - নতুনত্ব - পি ও। যেদিন সন্ধ্যায় আসর বসত সেদিন রাত্রে বিছানায় পি কে অধিক উত্তেজিত পেতাম।

ওই - ওই - মাথার বাঁদিকটায় যন্ত্রনা ঝিলিক দিচ্ছে। ক্রমশঃ ওটা আমাকে পেড়ে ফেলবে। ওটাকে বাড়তে দিলে চলবে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। আর একটু বোস, মাথায় জল থাবড়ে আসি...

একলা বসে খেতে বড় বিরক্ত লাগে, বুঝলি। আসলে চিরকাল কয়েকজন একসঙ্গে বসে খাওয়া অভ্যাস। অন্ততঃ দুজন তো বটেই। ছোটবেলায় ভাই বোনেরা একসঙ্গে খেতাম। স্কুল যাওয়ার সময় বারান্দায় একসঙ্গে লাইন দিয়ে বসতাম। এর যেটা ভাল লাগত না সেটা ওর পাতে তুলে দিতাম। কার মাছটা একটু বড় কার বা মাংসের মধ্যে হাড় - এসব নিয়ে খুনসুটি করতাম।

.... সেখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দুজন - পি ও আমি - আর এখন আমি একা হয়ে গিয়ে খাবার টেবিলে - খাবার যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না। দুপুরে অফিসে অবশ্য কয়েকজন একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া হয়। যাই হোক, তুই এসে খানিকটা অভাব মিটেছে। কিঁউ কিঁউ - কি বলছিস? আসল গল্পটা? বলছি বলছি।

ছুটির দিন সন্ধ্যার খাইদাই আসরে পাঁচজন পুং এর দুজন ছিল ব্যাচেলর। তুইতো ইংরেজি বুঝিস না, বিলিতি কুকুর হলে বুঝতিস, কিন্তু তুইতো নেড়ি কুত্তি, বরং হিন্দিটা ভাল বুঝবি - ব্যাচেলর মানে বাংলায় অবিবাহিত, হিন্দিতে কুঁয়ারা - অবিবাহিত মানে বুঝিস? মানে যার বিয়ে হয়নি। তোদের অবশ্য ওসবের বালাই নেই। হ্যাঁ, পঞ্চম জন যে আসরে শেষে যোগ দিয়েছিল - তার নাম ধর কিং। ও আমাদের অফিসের স্থায়ী কর্মী নয়, তবে অনেক কাজই করত। ও ফ্রিলান্স ক্যামেরাম্যান - ওই প্রস্তাবটা দিয়েছিল, বলেছিল - বৌদি, আপনার এমন সুন্দর চেহারা, আপনি মডেলিং করতে পারেন - না, না, মডেলিং মানে খারাপ সেন্স এ নেবেন না। এই ধরুন গয়নার বিজ্ঞাপন। বড় বড় জুয়েলারী দোকান এটায় খুব ঝুঁকেছে। আপনাকে মানাবেও খুব। বলেন তো দেখি। আমার কাছে খোঁজ খবর আছে। ভাল টাকাও দেবে।

সকলেই প্রস্তাবটা হৈ হৈ করে সমর্থন করল - খুবই ভাল - আহা! কলকাতার মাথার ওপর চারিদিকে জ্বল জ্বল করবে পি এর জড়োয়া গহনা শোভিত সুন্দর মুখ!

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। রূপালী জগতের অনেক সোনালী গল্প শোনালো কিং - ওই যে সব নায়ক নায়িকাদের অতীব সুন্দর মুখ পর্দায় দেখেন ওর অনেকটাই মেকআপ এর প্রসাধন। আপনার ব্যবহৃত এসব দামী প্রসাধনের চেয়ে পঞ্চাশ একশ গুণ বেশি দামী। ওইসব দামী প্রসাধনের মেকআপ নিয়ে নানারকম আলোর কায়দায় জড়িয়ে তবে ওনারা কিন্নর কিন্নরী। ওই সব নায়িকাদের চেয়ে আপনি কম সুন্দরী নন, বরং বেশিই! ঠিক হলো কথাবার্তা বলে নিয়ে একদিন কিং পি কে নিয়ে যাবে বিখ্যাত এক জুয়েলারী দোকানের মালিকের কাছে।

দিন ঠিক হলো।

আমি অফিস কামাই করে সঙ্গে যাব?

বলতে গিয়েও সঙ্কোচ লাগে, তাছাড়া সঙ্গে লেজুড়ের মতো যাওয়া - প্রেস্টিজ্ এ লাগল।

আমি অফিস গেলাম। দুপুরে কিং আসবে, পি তৈরি হবে, কেমনটি সাজলে মালিকের নজর ধরবে সেসব ঠিক করে দেবে কিং, তারপর নিয়ে যাবে।

উত্তীর্ণ হয়ে গেল পি। হবেই জানতাম।

ছবি তোলার দিন বাছা বাছা খানছয়েক শাড়ি ব্লাউস এ্যাটাচিতে ভরে কিং এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল পি। সব শাড়িগুলিই কিং এর বাছাই। ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি নীচে দেখলাম, নীচ থেকে উপরে তাকিয়ে ওরা হাত নাড়ল, আমিও হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। অফিস যাবার জন্য তৈরি হতে হবে - বুকের ভেতর কি যেন মোচড়।

কি ভাবছিস মিলি? এসব সূক্ষ্ম অনুভূতি কি তোদের আছে? তোর খালি খিদে, ওটা মিটলেই হয়ে গেল, ব্যস। এবেলা খেলাম, ওবেলা কি খাবো সে চিন্তাও নেই, নেই সঞ্চয়ের পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের তা নয়, পেট ভরার পরেও ওবেলার চিন্তা, আগামীকালের চিন্তা, সারা বছরের চিন্তা, সারাজীবনের চিন্তা। শুধু কি তাই? সারাজীবনের সব চাহিদার সর্বপ্রকার ব্যবস্থার মতো ধন সঞ্চিত থাকলেও মানুষ আরও চায়....

আমি জানি, তোর পেট জোড়া বুভুক্ষা সারা দিন খুঁটে খেয়ে যার সামন্যই ভর্তি হয়। এই একটা রুটি কতটুকু খিদে মেটাতে পারে? তবু এতটুকু খেয়েই তুই সন্তুষ্ট হয়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাস। আয়, জানলার আরেকটু কাছে এসে বোস। আয়, খেতে বসি দুজনে।

সারা কলকাতার মাথার ওপর পি এর সুসজ্জিত বিশাল আবক্ষ ছবি শোভা পেল। ট্যাক্সি করে সেই সব ছবি সারাবেলা ঘুরে ঘুরে দেখল পি আর কিং।একদিন গেল টাকা আনতে। মালিক নাকি খুশি হয়ে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন। জমিয়ে ' সেলিব্রেট ' করল সবাই। কিন্তু এইতো সবে শুরু! মালিক আবার ডেকেছেন, মোবাইলে।পি এর এখন নিজস্ব দামী মোবাইল।

৬২

পরের ছবি আরও সুন্দর! উন্মুক্ত কাঁধ, গলা, বক্ষের খাঁজের সামান্য আভাস নিয়ে সুসজ্জিত কণ্ঠহার...মোহিনী হাসি...

বিজ্ঞাপন এবার মুভি, টি.ভি. ও সিনেমার পর্দায়... কালিদাসের মেঘদূতের নায়িকা - তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা... বক্ষে কাঁচুলী... উন্মুক্ত গভীর নিম্ননাভী... খাজুরাহো কোণারকের মন্দিরগাত্রের নায়িকারা জীবন্ত হলো পি র শরীরে..

ওদের দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর। আমি পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আসর বসাতে কেউ আর আসে না। আসলে সবাই বুঝতে পেরেছিল।

অনেক কথা আটকে থাকে গলার কাছে, মুখে আসে না.... অনুচ্চারিত শব্দগুলি যেহেতু মেশে না বাতাসে তাই মাথা কুটে যায় বুকের ভিতর দেওয়ালে দেওয়ালে... অবসাদগ্রস্ত করে শরীর... মন...

আমি ক্রমশঃ বোবা হয়ে যাচ্ছিলাম। খুব প্রয়োজনীয় দু একটা কথাবার্তা ছাড়া দুজনে পাশাপাশি দুই অপরিচিত যেন। এক একদিন পি উজ্জ্বল হয়ে ভালবাসার প্রকাশ দেখাতে চাইত, বিবাহ পরবর্তী সেই সব দিনের মতো, কিন্তু বুঝতে পারতাম সেসব অভিনয়। তাই মন সাড়া দিত না, বরং আরও বেড়ে যেত দূরত্ব। শরীরে শরীর মেলাতে গেলে মনে হতো অন্য এক শরীরের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে এই নারী।

কি হলো? আবার হ্যা হ্যা করে জিভ বার করে হাসছিস? কবিত্ব করছি? মানে বুঝতে পারছিস না? দাঁড়া, ঝিমনো শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নিই - ব্যাস, বড় একটা পেগ টেনে নিলেই শরীর মন চাঙ্গা। ধুস্ শালী, ভাবিস না আমি দেবদাস হয়ে যাচ্ছি! এবার সোজাসুজি ভাষায় শোন - আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওরা দুজনে একেবারে জেবড়ে গেছে। ওই পাড়াটা বুঝলি শুধু তো ফ্ল্যাটের কমপ্লেক্স নয়, ফ্ল্যাটবাড়িও আছে আবার একতলা দোতলা পুরোনো বাড়িও আছে। মানে পাড়া বলতে যা বোঝায় তাই আরকি। আর পুরনো পাড়ার রোয়াকওলা বাড়ির রোয়াকে যুবকদের আড্ডাও আছে। তেমনি এক আড্ডার টিটকিরি কানে এলো অফিস থেকে ফেরার সময় - ভালমানুষ দাদা যায় অফিস করতে, আর দুপুরবেলা আরেকজন এসে দাদার জমিতে লাঙল দিয়ে যায়! কান

মাথা পুড়ে গেল একেবারে, কোনরকমে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ওই যে, অনেক কথা আটকে থাকে গলার কাছে, কিন্তু মুখে আসে না, মনে হলো পি কে বলি আমি শালা মাসে মাসে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট কিনে আনছি আর তুমি শা - কিন্তু আরও আছে –

একদিন সেই ফোনটা এল, টেলিফোন বলল - একটা কথা আপনার জানা দরকার, ওই জুয়েলারী মলিক তো কোটিপতি, ওনার একটি বিচিত্র শখ আছে, নিত্য নতুন সুন্দরী মেয়েদের উনি সাজিয়ে গুছিয়ে ভোগ করতে ভালবাসেন। কেমন সাজ জানেন? গহনা দিয়ে সাজান শরীর, যে শরীরে আবরণ বলতে ওই গহনা। উনি ঘনিষ্ঠদের বলেনও সে কথা - আভরণ দিয়ে যতটুকু আবরণ, ব্যস্! ওভাবেই উনি ভোগ করেন ধীরে সুস্থে। ওনার নিজের মুক্ত শরীরে তখন থাকে শুধুমাত্র একছড়া ভারী কণ্ঠহার, ভোগ শেষে সেটাই উনি উপহার দেন। ঘটনা সেই দিকে এগোচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে ফেরান। এখনও সময় আছে। ভেতরের কথা জানি বলেই আপনাকে সাবধান করলাম। ওই ক্যামেরাম্যানটা একটা মস্ত ঘুঘু, ওটাও কিছু টাকা খাবে। ওর ফোন থেকেই আপনার নম্বর পেয়েছি।

সেদিন রাতে ভারি এক সোনার নেকলেস পরে এল পি - সারাদিন পর।

অনেক কথা আটকে থাকে গলার কাছে, মুখে আসে না। অথচ বুকের মধ্যে পাক খেতে খেতে বেড়েই চলে যন্ত্রণা। সারাদিন কোথায় কাটাল পি? কোনো পাঁচতার হোটেলের ঠান্ডা ঘরে? না কি কোনো নির্জন বাগানবাড়ির ফুলের বাগানে সেজে উঠল খাজুরাহো সুন্দরী? ছবিটা চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছিল আর জ্বলে যাচ্ছিলাম। সম্ভোগের ও প্রাপ্তির সুখে মেদুর পি র মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমি কি এখনই ওকে খুন করব? ঘুচিয়ে দেবো ওই মাধুর্য? কিন্তু কিছুই পারলাম না। অনেক ইচ্ছা আটকে থাকে বুকের খাঁচায়, করা হয় না। আমি নিজেই বরং অপরাধীর মতো ঢুকে পড়লাম ঘরে, বালিশে মুখ লুকোতে চাইলাম।

পি ঘরে এলো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখল নেকলেস, আপন মনে বলল - কী সুন্দর! আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে ভাবলাম - হ্যাঁ রে কুত্তি, মাত্র

কঘন্টা শরীর দিয়ে পেয়েছিস, সুন্দর হবে না! কিন্তু বলতে পারলাম না।

কাপড়চোপড় ছেড়ে পি বাথরুমে গেল, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। ও কি শুচি হতে চাইছিল? শুদ্ধ?

এই মিলি, আবার হ্যা হ্যা করে হাসছিস?

একদিন পি আর ফিরল না। অফিস থেকে ফিরে ছয় চেয়ারের ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা চিঠি পেলাম - আমি কিং এর সঙ্গে বম্বে চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। আমাকে খোঁজার বা ফেরনোর চেষ্টা করো না। ক্ষমা করো। ইতি - পি।

মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে... অনেকটা হুইস্কি খাওয়া হয়ে গেছে.... এ্যাই মিলি, অমন চুপ মেরে গেছিস কেন? আজতো ছুটির দিন, সারাদিন আমি ঘরে, তুই কোথায় ছিলি? দুপুরবেলা আলুভাতে ডিমভাতে ভাত রান্না করলাম। হোটেলে খেতে গেলেও হতো, কিন্তু ওই স্টেশন অব্দি হেঁটে যাও, আবার আসো - ইচ্ছে হলনা। ভাত একটু বেশিই হলো, ভাবলাম তোকে দোবো, কিন্তু দেখতে পেলাম না। মিলি মিলি করে অনেকবার ডেকেওছিলাম। ওই শেষ ট্রেন চলে গেল, আয়,এবার খেতে বসা যাক।

ওঃ! তুই এখানে? বাঃ! নাগর জুটিয়েছিস? বেশ বেশ! অফিস থেকে ফেরার সময় গলির মুখে এসে ভাবছিলাম মিলি কোথায় গেল? ফেরার সময় রোজ গলির মুখ থেকে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে আসে, আজ নেই! তা নাগর জুটিয়ে এখানে আমার ঘরের সামনে কেলি করছিস - কি করে জানব বল! বাঃ, আমাকে যে দেখতেই পাচ্ছিস না! ঠিক আছে, রুটি খাওয়ার সময় দেখব।

.... ওঃ! এ তো দেখছি সংযুক্ত হয়ে গেছিসরে! স্নান করতে এতক্ষণ গেল, ভাবছিলাম তোর নাগর বোধহয় বিদেয় হয়েছে, তা নয়, এ যে দেখি -

ঠিক আছে, যতক্ষণ তোরা না বিযুক্ত হচ্ছিস ততক্ষণ একটু হুইস্কি খাওয়া যাক...

.... এইতো, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে এসে বসলি, এবার জঠরের খিদে মালুম

হয়েছে, এ্যাঁ? কিন্তু তোর ভাগীদারও যে রয়েছে রে! দ্যাখনা, একটুকরো রুটি ছুঁড়লে কি হয়। ওই দ্যাখ, তোর নাগর দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করতে করতে তোকে খেদিয়ে রুটির টুকরো মুখে পুরে দিল। কি? কেমন বুঝছিস? অমন কাচুমাচু হয়ে দূরে সরে রইছিস কেন? দাঁড়া, ব্যবস্থা করছি। এই খালি বোতলটা ব্যাটার মাথায় টিপ করে মারলে -

হ্যাঃ! হ্যাঃ! ব্যাটা কাঁউ কাঁউ করতে করতে ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। লেগেছে মোক্ষম! আয়, এগিয়ে আয়, আজ মাংস এনেছি, ঝোলে ভিজিয়ে রুটি দোবো, হাড়ের টুকরো দোবো, আয় কাছে আয়...

বেলাশেষের রোদ্দুরে মানুষ মানুষী

ছেলেবেলায় সে কোথায় যেন একবার বেড়াতে গিয়েছিল। মা বাবা আর তারা দুই ভাই বোন। সে এক নদী, বালুচর বহুদূর বিস্তৃত, মাঝ দিয়ে ঝিরঝির জলধারা বয়ে যায়। ওপারে শালবন।

সেখানে ছোট এক টিলা, টিলার ওপর ঝুঁকে আছে ছোট একটা বাড়ি চারপাশে ফুলের বন। এখানে ওখানে সরল দেহ ইউক্যালিপ্টাস আর দেবদারু। বাড়ির পেছনে ঢালু পথ দিয়ে তারা নেমে গিয়েছিল নদীতে। সারাদিন ছোটাছুটি খেলা। সে এক দিশাহারানো সৌন্দর্য! সেখানে তারা ভাইবোনে বালি দিয়ে ঘর তৈরীর খেলা খেলেছিল।

সে বছর বাবা তাকে একটি আংটি দিয়েছিলেন। উজ্জ্বল পাথর বসানো আংটি। বালির ঘর গড়তে গিয়ে সে আংটিটা খুলে রেখেছিল পাশে। তারপর যখন সূর্য অস্ত যায় যায় তখন আকাশের রঙ আর আলোর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তারা ফিরেছিল।

সন্ধ্যাবেলা মা বললেন - এই, তোর আংটি কোথায়?

- তাইতো! - বলে দে ছুট দে ছুট।

- কোথা যাস্, শোন - মা পিছনে পিছনে।

- সেইখানে, বালির ঘর করেছিলাম - বলতে বলতে সে খরগোসের মতো ছুটছিল। মা অতো ছুটতে পারেন না। মা কে পিছনে ফেলে সে ছুটছিল বালির চরে। তখন জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে নদীর বুক, দূর থেকে সে দেখল বালির ঘর আর তার পাশে চিকচিক করছে তার আংটির পাথর....

.... প্রত্যেকের বুকের ভেতর একটা ঘর থাকে, গোপন ঘর। সে ঘরে সকলে সারাজীবন ধরে তুলে রাখে ছোট ছোট অনেক ঘটনা, অনুভব। সারাজীবনের খেলায় কত কিছু হারিয়ে যায়, কিন্তু কিছুকিছু খেলা কিছুকিছু অনুভব ভোলা যায় না। সেগুলি থরেথরে সাজানো থাকে বুকের গোপন ঘরে। কখনও কখনও আনমনে সেই সব সোনার পিদিমের মতো সুর্লভ সংগ্রহ দশ আঙুলে যেন তুলে নেয়, সযত্নে ধুলো ঝাড়ে, গভীর মমতায় নেড়েচেড়ে দেখে....

জানালায় শরীরের ভার রেখে দাঁড়িয়েছিল সে। অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে সে নীচের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখছিল না। আসলে বুকের গোপন ঘর খুলে গভীর মমতায় নাড়াচাড়া করছিল দুর্লভ সংগ্রহগুলি, তাই চোখের দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ছিল না।

এ শহরের বিশাল ময়দানের কোল ঘেঁসে এগারতলা এই বিশাল অফিস বাড়ি, যার সপ্তম তলে তার ঘর। সেই ঘরে সে একা। তার পিছনে টেবিল জুড়ে ছড়িয়ে আছে কাজ, তার চেয়ার সাগ্রহে যেন অপেক্ষা করে আছে তাকে কাজে বসানোর জন্য। কিন্তু আজ সারাবেলা তার কি যে হয়েছে! অনেকক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কেটে গেল।

দরোজায় হাতল ঘোরানোর শব্দ। একটু প্রকৃতিস্থ হলো সে, মুখ ফেরালো, তার পি.এ.। ঘরে ঢুকে সে একটু অবাক - এনিথিং রং স্যার?

- ও, নো।

- মে আই গো নাউ?

সে চমকে উঠল, ঘড়ি দেখল - পাঁচটা বেজে গেছে, - ইয়েস ইয়েস....পুণরায় ফিরে দাঁড়াল জানালায়, ময়দানের দিকে তাকাল। ডিসেম্বরের শেষ। এখন দ্রুত সন্ধ্যা নামে। কে যেন অতি ব্যস্ততায় ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখে বিকাল। সব কিছু কেমন বিষন্ন হয়ে যায় - এরকম ভাবতে ভাবতে সে ময়দানের ঝাপসা অন্ধকারে বিষন্ন গাছপালা দেখছিল। তারপর রাস্তার দিকে - দ্রুত ছুটে যাচ্ছে গাড়ির স্রোত। সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত। এই মানুষেরা ঘরে ফেরার জন্য এত ব্যস্ত কেন? বিষন্ন হাসি ফুটল ঠোঁটে - তোমার মতো সবাই কি আর একা হে? - আলতো গলায় বলল, চেয়ার টেনে বসল।

তার সামনে টেবিলের ওপর একটা ফাইল। বন্ধ ফাইলের ওপর দুহাত রাখল। বুকের মধ্যে চঞ্চল রক্ত। ফাইল খুলতে গেলে হাত কাঁপল। মুখে একটা হতাশার শব্দ করল - এই পয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছেও আমার সেই অদ্ভুত দুর্বলতা গেল না।ভাবতে ভাবতে ফাইল খুলে ফেলল, তারপর যেন খুব বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করেছে এরকম ভাব করল।

একগাদা চাকরির দরখাস্ত বোঝাই ফাইল। ওপরের কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। এক কোনে পিন দিয়ে আঁটা ফটোগ্রাফ, কাছে টেনে নিল। আবার তার হাত কাঁপছিল। সন্তর্পণে সে দরজার দিকে তাকাল - যেন কেউ দেখছে তার ক্রিয়াকলাপ।

সেই দুপুর থেকে তার উৎপাত থামছে না। অথচ এই বয়সে এই পদমর্যাদায় এই কর্মব্যস্ততায় এত দীর্ঘদিন কাটিয়েও তার মনে যে এমন দুর্বলতা এখনও ছিল!

তার কাজে সহযোগীতার জন্য একজন জুনিয়র অফিসার প্রয়োজন। দিন দিন কাজ এতো বাড়ছে যে তার পক্ষে একা সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। আজ দুপুরে ঊর্দ্ধতন ম্যানেজার এই ফাইলটি পাঠিয়েছেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোন - পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট বাছাই করে যে কজনকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকেছে তাদের দরখাস্তের ফাইলটা পাঠানো হলো, যেহেতু আপনার অফিসার তাই আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবেন। একবার দরখাস্তগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিন।

ফাইল খুলেই বিপর্যয়! বুকের মধ্যে ছলাৎছল রক্ত। কোথা হতে ছুটে এলো দুরন্ত বাতাস। সে তাড়াতাড়ি ফাইল বন্ধ করে দিয়েছিল।....তারপর মনের গোপন ঘর খুলে যায়....পরম যতনে দশ আঙুল তুলে নেয় দুর্লভ সোনার পিদিম....

... কতদিন আগেকার কথা.... সে এক শরতের বেলা....সেদিন দুপুরে আকাশ নীল, নম্র রোদ, উসখুসে বাতাস। শরতের এরকম দুপুরে মনের মধ্যে একটা উজ্জ্বল ভাব আনে। সেই উজ্জ্বল দুপুরে সে আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েছে, বাড়ি ফিরবে। হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রীটের মোড়, রাস্তা পেরোবে তারপর বাস ষ্ট্যান্ড, ফুটপাথ থেকে নামতে গিয়ে দেখল - রাস্তার বিস্তার এখানে নদীর চরের মতো। সেই বিস্তৃত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মেয়ে। দুপাশ দিয়ে যাচ্ছে আসছে গাড়ির স্রোত। সম্ভবতঃ রাস্তার ওপারে যাবে বলে সে এগিয়েছি ওপাশে গাড়ি - ফিরেছে - এপাশেও। ভীষণ বিব্রত তার মুখ, একটু

৬৯

দিশাহারা ঠোঁটের বাঁ পাশ দাঁতে অল্প চেপে রয়েছে। পরণে সাগরের মতো নীল সিল্কের শাড়ি। সহসা আঁচল উড়ল হাওয়ায়, আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিতে গিয়ে উথলে উঠল চুলের রাশ, এলো খোঁপা ভেঙে গেল। নম্র রোদ চিকন আভা ছড়িয়েছে মুখে, গায়ে। অপলক তাকিয়েছিল সে, সহসা চোখে চোখ।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের দেখা, কিন্তু কখনও কখনও দেখা শুধু দেখা নয় - দর্শন - অনেক গভীরে কিছু ছুঁয়ে যায়, নড়ে যায় বুকের ভিত। সে মেয়েটির কাঁপা কাঁপা চোখের পাতা দেখল, আর লজ্জার উচ্ছাস দেখতে দেখতে তার পায়ের তলার মাটি যেন শিহরিত হলো। তারপর তারা রাস্তা পেরিয়েছে, বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াল দুজনেই। তার বুকের মধ্যে সেই প্রথম ছলাৎছল রক্তস্রোতের অনুভব। খুব ইচ্ছা করছিল তাকাতে কিন্তু পারছিল না। বাস এসে গেল, তারা বাসে উঠল। মেয়েটি বসেছে। তার খুব ইচ্ছা করছিল সামনে দাঁড়াতে, কিন্তু পারল না। অনেকের পিছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কেমন গুটিশুটি হয়ে বসে আছে সে, মুখ নীচু করে।

শহর পেরিয়ে একই জায়গায় নামল তারা। মেয়েটির পিছনে নামতে গিয়ে একটা সুন্দর গন্ধে তার বুক ভরে গেল। দ্রুত পায়ে মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। সে নিথর দাঁড়িয়ে দেখল যতদূর দেখা যায়। সে অনুভব করছিল প্রেম। বুক জুড়ে তার আবির্ভাব। কি চকিত! যেন তীক্ষ্ণ আঘাতে বিক্ষত করে দিল বুক।

....কতদিন আগের কথা। এমন একান্ত করে আমি তোমাকে কখনও দেখিনি - ভাবল সে, কাঁপা কাঁপা আঙুল রাখল কাগজের ওপর, নামটা পড়ল – মিস.অবন্তী সরকার - হ্যাঁ, এই নাম। তারপর? এবার? ভাবতে ভাবতে আঙুল সরালো - ফাদারস্ নেম - লেট্ বিশ্বনাথ সরকার - আহ্! - কেমন একটা খুশির নিঃশ্বাস ফেলল সে, চেয়ারে একটু দুলে নিলো, তারপর - ধেৎ - বলে নিজেকে ধমকাল - এই বয়সে কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? পাগল আর কাকে বলে! - মিস্ দেখেই এত খুশি! আহারে! তবু যদি না থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে চলে যেত রে! - ভাবতে তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন্ করে উঠল। মুখ করুণ - আমি তাকে পাইনি ঠিক কথা, তবু আর কেউ তো তাকে পায়নি - এটুকু ভাবতেও ভাল লাগে না? ফাইল বন্ধ করে দিলো।

গা এলিয়ে বসল। নির্জন ঘর। সে একা। বুকের মধ্যে অস্থিরতা - আমি বড় একা - ফিসফিস করে বলল সে - একা একা একা! টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল, ফাইলটা খুলল - অবন্তী, তুমি একা কেন? - প্যাড টেনে নিয়ে লিখল - অবন্তী, আমি বড় একা, লিখে চুপচাপ একটু তাকিয়ে রইল,পাতাটা ছিঁড়ে কোটের পকেটে পুরে ফেলল।

অফিসের গাড়ি রোজ তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, বাড়ি পৌঁছে দেয় - নীচে নেমে এসে সে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল। হাঁটতে ইচ্ছা করছিল। ফুটপাথে নামলে এক ঝলক হিমেল বাতাস তাকে সম্ভাষণ জানাল। কোটের আরেকটি বোতাম এঁটে দিয়ে টাইটা একটু আঁটসাঁট করল, তারপর পকেটে দুহাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। ঘনিষ্ঠ দুই যুবক যুবতী নীচু গলায় কথা বলতে বলতে তাকে অতিক্রম করে গেল, তাকিয়ে দেখল সে, কেমন ঈর্ষা জাগল। পৃথিবীর সমস্ত যুবক যুবতী যে যার সঙ্গী বেছে নিয়ে আনন্দ নিকেতনে বেড়াতে গিয়েছে - এরকম একটা অনুভব তাকে ঈর্ষান্বিত করছিল।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরল সে। মা দরজা খুলে একরাশ বকুনি। কি ব্যাপার রে? দশটা বাজে। কোথাও যাবার কথা ছিলটিল বলে যাসনি তো? আমি কখন থেকে হানটান করছি।

আরে থাক থাক, তোমার ছেলেকে তুমি আর ছোট্ট খোকার মতো কৈফিয়ত চেও না - বাবা গম্ভীর মুখে বললেন। সোফায় বসেছিলেন, বইয়ের পাতায় চোখ। বাবা এখনও টি. ভি. র চাইতে বই পড়তেই বেশি মনোযোগী, বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বললেন - তোমার ছেলে খুবই ভাল ছেলে, কোনরকম বদ দোষটোষ কিছু নেই।

- তুমি থামতো, অনেক রাত হয়েছে, খাবে চল, যা খোকা জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আয়।

রোজ রাতে তারা একসঙ্গে খেতে বসে। এটা বাবার ইচ্ছানুযায়ী বহু দিন ধরে চলে আসছে। ইদানিং প্রায়শই কথায় কথায় বাবা ঠিক ঘুরে ফিরে একটা প্রসঙ্গে চলে যান যে তাঁদের খাওয়ার টেবিলে চারটে চেয়ার, নমিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর বহুদিন ধরে একটা চেয়ার খালি পড়ে থাকছে, কিন্তু না ছেলে, না

ছেলের মা, কেউই সেটাকে পুরণ করার ব্যাপারে দেখছি আগ্রহী নয়... ইত্যাদি

খাওয়ার শেষাশেষি মা বললেন - খোকা, নমিতা মালদা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছে রে। ওর এক বন্ধু কলকাতায় এসেছে, তার হাতে। এই মিষ্টি খেতে তুই তো ভালবাসিস।

- আমার চেয়েও বাবা কিন্তু বেশি ভালবাসে মা।

- আরে না না, আমার আর বেশি মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়।

- কি যে বল না! তোমার সাহস দেখছি দিন দিন কমে যাচ্ছে, সামান্য মিষ্টি খাবে তাতেও ভয় পাচ্ছ। - কথাটা বলে সে একটু থিতিয়ে গেল, দেখল খাওয়া বন্ধ করে বাবা একটু গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন, তারপর -

- অবশ্যই আমার সাহস কমে গেছে। যাবেই তো। পণ্ডিতেরা বলে গেছেন চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে মানুষের অবরোহন, তা সে বয়সটা আমি অনেক দিন পার হয়ে এসেছি। - একটু থামলেন, তারপর - কিন্তু আমি এই ভীতু মানুষটা সারা জীবন ধরে অল্পসল্প সাহস নিয়ে তো অনেক কিছুই করলাম। সংসার করলাম, ছেলেমেয়ে মানুষ করলাম, চাকরি করে যা সঞ্চয় টঞ্চয় তা দিয়ে রিটায়ারমেন্টের পর এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করেছি, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি মোটামুটি ভালই। কিন্তু তুই কি করলি? চল্লিশে পৌঁছতে তো বেশি দেরি নেই, তুইতো সামান্য সাহস করে একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারলি না।

- আঃ! তুমি আবার বকাবকি শুরু করলে -

- না জয়ন্তী, না - বাবা বাঁ হাত তুলে মাকে থামাতে চাইলেন যেন - তোমার ছেলে এত ভাল না হয়ে যদি একটু কারাপ হতো আমি খুশি হতাম। অন্তত দুচারটে মেয়ের সঙ্গে স্ক্যান্ডালও করত তাহলে বুঝতাম তার লাইফ আছে, অনুভূতি আছে - বলতে বলতে বাবা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

মুখ নীচু করে বসেছিল সে। একটু পরে মুখ তুলে দেখল মা চুপচাপ বসে আছেন, দুচোখ ছলছল। চোখে চোখ পড়তে বললেন - কেন তুই বিয়ে করতে চাসনা? কেন? কেন?

....আমি সত্যিই ভীতু। তার চেয়েও বেশি - কাপুরুষ। আমার কাপুরুষতার ক্ষত

আমিতো বহুদিন ধরে বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছি।সেই নব যৌবনকাল... সেই প্রথম দেখা...যাকে ভালবাসলাম তাকে শুধু দেখে গেলাম দিনের পর দিন, আর বুকের মধ্যে ভীরুতা। কখনও তার কাছে যেতে পারিনি। অথচ এরকম হওয়া উচিত ছিল - আমি পুরুষ, পৌরুষে উজ্জ্বল তার সামনে দাঁড়াব, সে নারী, অবনত, আমি তাকে জয় করে নেবো - এইতো!

....পুরানো কথা.....

....সমীর, ওর দাদা তোর বন্ধু না?

- হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটিতে যাবার পর আলাপ হয়েছে।

- তুই ওদের বাড়ি যাস?

- হ্যাঁ, মাঝে মাঝে।

- আহারে! আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম!

- কি পাগলের মতো বকছিস? আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া তোর কতদিনের সখ। কিন্তু এরকম কথাবার্তা বলছিস কেন? আচ্ছা, তোকে একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাব।

- ওরে বাবা! না! - শুনেই বুক ধড়ফড়।

- তবে মরগে যা, ও আবার প্রেম করবে!

- আচ্ছা সমীর, তুই ওর সাথে কথা বলিস?

- হ্যাঁ।

- কি বলিস? তুমি না আপনি?

- আপনি কেন বলব, তুমি বলি। তা তুই ও ও করছিস কেন? ওর কি নাম নেই?

(সমীর তো জানেনা, নামটা উচ্চারণ করতে গেলে কেমন আড়ষ্টতা। সমীর যদি বুঝত! আহা, সমীর ওকে তুমি বলে! সামনাসামনি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলে, কি আশ্চর্য!)

- আচ্ছা সমীর, তোর ওকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে না?

- তোকে আমি খুন করে ফেলব ইডিয়েট।

....আচ্ছা সমীর, ও তো আশুতোষ এ পড়ে, মর্নিং এ।

- আচ্ছা, খবরটবর নিচ্ছিস তাহলে। পিছন পিছন ঘুরছিস নাকি?

- না রে না, তা যদি পারতাম! আচ্ছা, ও কি পড়ে?

- বি.এস.সি. কেমিস্ট্রিতে অনার্স আছে।

- ও খুব ভাল গান গায়, তাই না?

- হ্যাঁ, এক আধদিন আমাকেও শুনিয়েছে।

- ইস্, তুই কি নিষ্ঠুর সমীর, তুই ওর গান শুনলি?

- কেন শুনব না?

- তোর একবারও আমার কথা মনে হলো না?

- আঃ! কি মুশকিল!

একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ সমীর এলো, বলল - চল্। সে বলল - কোথায়? চল্ না, নে নে তাড়াতাড়ি জামা পরে নে। একরকম টেনে বার করল ঘর থেকে। তারপর তারা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো ট্রাম ডিপো পেরিয়ে গল্ফ ক্লাবের নিঝুম মাঠের পাশে।

.... এ দিনটার কথা মনে পড়লে তার মরে যেতে ইচ্ছা করে। এখনো এতদিন পর এই শীতের গভীর রাতে অন্ধকার ঘরে একা সে লজ্জায় মরে যেতে চাইল.... একটা দীর্ঘ দেবদারু গাছ রাস্তার পাশে, পাতার আড়ালে কোথাও একটা পাখি শব্দ করছিল টু-কি টু-কি। সমীর বলল - ওকে আমি বলেছি।

- কি বলেছিস?

- এখানে আসতে বলেছি।

- সমীর আমি যাই, আমার শরীরটা ভাল নেই।

- তোকে আমি খুন করে ফেলব, আমার বুঝি কোনো প্রেস্টিজ নেই?

- কিন্তু ওকে কি বলেছিস?

- বিশেষ কিছু না, বলেছি, তুমিতো গানের স্কুল থেকে ছটা নাগাদ ফেরো, আমি এখানে থাকব, তোমার সাথে একজনের আলাপ করিয়ে দেবার আছে।

শুনে তার কপাল ঘামছিল। তারা এসেছিল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে এলো। সমীর খুব বকবক করছিল – আমাকে একটু ভয় করে

একেবারে গুটিশুটি হয়ে কথাটা শুনল, জানিস, মুখটা শুকনো শুকনো হয়ে গিয়েছিল –

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা। অবশেষে সে এলো। তখন সাতটা বাজে। ধীর পায়ে হেঁটে আসছিল। সমীর দুপা এগিয়ে গেল।

- অবন্তী, তোমাকে যার কথা বলেছিলাম, ও তোমার সম্বন্ধে খুব ইন্টারেস্টেড - শুনতে শুনতে তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল সমীরের কলার ধরে ফেরায় বা সে ছুটে পালায়। কিন্তু কিছুই পারছিল না।

শুকনো শুকনো মুখে অবন্তী চোখ তুলল, দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ, দ্রুত পায়ে চলে যেতে যেতে বলল - আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

.... গড়িয়ার এই বাড়ি তখন সবে তৈরি হচ্ছে। সে বাবাকে বলেছিল - আমি আর টালিগঞ্জে থাকব না। এই ভাড়া বাড়িতে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। যথেষ্ট জায়গা নেই। এই ফাইনাল ইয়ারে আমি ভাল করে কাজ না করলে কি করে ভাল রেজাল্ট করব? তুমি গড়িয়ার বাড়িতে আমাকে কোন রকমে একটা অন্ততঃ বড়সড় ঘর ফিনিস্ করে দাও।.... আসলে সে পালাতে চাইছিল। সারাক্ষণ তার মনে হতো সবাই জেনে গেছে তার পরাজয়। সকলে তাকে দেখলে মনে মনে উপহাস করে। এক মাসের মধ্যেই সে এবাড়িতে পালিয়ে এসেছিল।

.... এসব কথা মনে পড়লে তার এখনও মরে যেতে ইচ্ছা করে। অন্ধকারে সে বিছানা থেকে নামল। তার গরম লাগছিল। আলতো হাতে বাইরের জানলা খুলল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া, আহ্! জানলার গরাদে মুখ রাখল।

বারান্দার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।... আমি একটু ঘুমোতে চাই। হে ভগবান, আমার চোখে একটু ঘুম দাও....

সারারাত সে ভাল করে ঘুমাতে পারল না। একটা অস্থিরতা তাকে বিচলিত করছিল। আগামীকাল অবন্তী আসবে। কেমন আছে সে? অনেক দিন হলো, অনেক বছর বয়স বাড়ল। এখন তাকে কেমন দেখতে হয়েছে? - ভাবতে ভাবতে কখনও হালকা ঘুম, আবার সরে যাচ্ছিল। ভোরবেলা উঠল, চাদর গায়ে ছাদে চলে এলো।

ছাদ জুড়ে ফুলের বাগান। বাবার নিজ হাতের যত্নে এই সব গাছেরা পুষ্পবতী। রোজ ভোরে বাবা এখানে পদচারণা করেন। বাবা বলেন - আমাদের সভ্য মানুষের বড় দোষ আমরা সূর্য ওঠা দেখি না। বাবা রোজ সূর্য ওঠা দেখেন, সূর্য প্রণাম করেন... ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং... সকালের প্রথম রোদ্দুর কেমন করে ফুলের পাপড়িতে চিকন আভা ফেলে, কেমন শিশির বিন্দু ঝিকমিকিয়ে ওঠে....

ছাদে উঠে সে ধীরে ধীরে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল, বৃদ্ধ মানুষটি অবাক হয়ে তাকালেন। সে দূরে কোথায় দৃষ্টি ভাসিয়ে বলল - আমি তোমার সঙ্গে সূর্য ওঠা দেখতে এলাম।

অফিসে এসে প্রথমেই সে সেই ফাইলটি খুলল, তারপর অবন্তীর দরখাস্তটি সকলের নীচে গুঁজে দিলো। ফাইল মুড়ে সোজা চিফ্ ম্যানেজারের ঘরে। তার পরণে স্টিল গ্রে স্যুট্, নিখুঁত টাইয়ের নট্, আর বুকে লাগানো বাবার দেওয়া লাল টুকটুকে গোলাপের একটা আধফোটা কুঁড়ি।

- লুকিং ভেরি ব্রাইট টুডে! - হাসতে হাসতে বললেন চিফ্।

.... আমার বুকে আজ অনেক সাহস - মনে মনে বলল সে - আজ আমি বাবার কাছ থেকে কেন ফুলটা চেয়েছি বাবা জানেন না - আমি বাবার কাছ থেকে সাহস উপহার নিয়েছি....

বিশল ঘরটি আজ সুন্দর করে সাজান হয়েছে। এটা তাদের বিশেষ কনফারেন্স রুম।

অফিসার গ্রেডে ইন্টারভিউ নিলে এই ঘরেতেই নেওয়া হয়। মোট ন-জন বসবেন ইন্টারভিউ বোর্ড এ। আর একটি চেয়ার পরিক্ষার্থীর জন্য। চিফ্ এর সঙ্গে দেখা করে সে সোজা চলে এসেছে এ ঘরে। বসলো দুটি প্রান্তের দুটি চেয়ারের একটিতে, অর্থাৎ পরিক্ষার্থীর মুখোমুখি। তার বুকের মধ্যে ছলাৎছল শব্দ করছিল রক্তস্রোত। কাঁপা কাঁপা হাতে ফাইল খুলল, যেন গভীর ভাবে খুঁটিনাটি দেখছে এভাবে ঝুঁকে পড়ল। দরোজায় হাতলের শব্দ, মৃদু কথাবার্তা, বোর্ডের সকলে এসে গেলেন।

পরীক্ষার্থীরা একে একে আসছিল, যাচ্ছিল, মহিলা, পুরুষ, প্রশ্ন, উত্তর, মৃদু গুঞ্জনের মতো কানে ভাসছিল তার। কিছুই সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না।

কেউ তাকে হয়ত বলছিল - আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ছিল। তারপর পরের জনের নাম বললে - বেয়ারা ডেকে আনছিল।

ফাইল নিয়ে সে একটা ছোট্ট খেলা খেলছিল, যে পরীক্ষার্থী চলে যাচ্ছিল সেই দরখাস্তটি দাগ দিয়ে সকলের নীচে চালান করে দিচ্ছিল.... ভাবছিল তুমিই শেষ... কখন একটি কাগজ তুলেই দেখব তোমার ছবি। আমি এখনও জানি না তুমি কত দূরে আছ। হয়ত এখনই এই কাগজটি তুললেই চলে আসবে। যদিও আমি খুব সহজেই দেখে নিতে পারি তুমি আর কতজনের পরে আসবে, কিন্তু আমি তা দেখব না।

এভাবে খেলা করতে করতে হঠাৎ বুকের মধ্যে সেই প্রকার শব্দ - যেন একপাল চিত্রল হরিণ দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়...আড়ষ্ট গলায় সে বলল - মিস্ অবন্তী সরকার -

তারপর আবার তারা মুখোমুখি... সেই যেন নদীর চরের মতো বিস্তৃত পথ...মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, তোমার চোখের পাতা কাঁপে... যেন সমুদ্রের তীরে ঝাউবন....এখন যেন কোনো নির্জন দ্বীপে তুমি আমি মুখোমুখি, চোখে চোখ রেখে বুকে জমে ওঠে যন্ত্রণা।

- সিট্ ডাউন প্লিজ - কে একজন বলল, কিন্তু অবাক অবন্তী বোধহয় শুনতে পেল না। সে হাত তুলল, সামনের চেয়ার দেখাল, অবন্তী যেন সম্মোহিত এভাবে বসল, মুখ নীচু করে নিলো, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছে।

.... তুমি কত রোগা হয়ে গিয়েছ। তোমার মুখটা কি শুকনো ম্লান...তুমি কি এখন মলয় পবন আর চাঁদের কিরণ আহার করো নাকি? অথবা পাখী হয়ে উড়ব ভেবেছ? আমি তোমাকে ভীষণ বকবো...সে বুকে হাত রাখল, গোলাপের স্পর্শ।

চিফ্ ম্যানেজার মিস্টার সেন প্রশ্ন করছিলেন - আচ্ছা, আপনিতো দেখছি বি. এস. সি. পাশ করেছিলেন, তারপর আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন কেন?

- প্রথমে জেনারেল এডুকেশনে ছিলাম, পরে ইচ্ছা হয়েছিল –

....কি মিষ্টি তোমার কণ্ঠস্বর! মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন আমি সমীরের সাথে দেবদারু গাছের নীচে অপেক্ষা করছিলাম সেদিন কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছিল, টু-কি, কি মিষ্টি!....ভাবতে ভাবতে সে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। তার বুকের মধ্যে শিহরণ আমি তো দরখাস্তটা পড়ে দেখিইনি। তুমি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলে? কেন অবন্তী? - তার বুকের মধ্যে খুশি উথলে উঠল। সন্তর্পণে সে মিস্টার সেনের দিকে একটু কাৎ হলো, ফিসফিস করে বললো - জিজ্ঞাসা করুন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সম্পর্কে আপনার। কি ধারণা।

প্রশ্ন শুনে অবন্তী বেশ থতমত, দেখে খুব মজা লাগল তার। ওপাশ থেকে মিস্টার ঘোষ প্রশ্ন করলেন - পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাজ সম্পর্কে আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কি?

- ফ্রী লান্স কাজ অনেক করেছি কিন্তু চাকরি করিনি, তবে সুযোগ পেলে আরও ভাল কাজ করতে পারব।

মিস্টার সিকদার কথাটা লুফে নিলেন, বললেন - ধরুন আপনাকে সুযোগ দেওয়া হলো, কিন্তু এখন যদিও আপনি ব্যাচিলর, বিয়ের পর অনেক মেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়, তখন আমাদের আবার এসব ঝামেলা, আবার নতুন একজনকে খুঁজতে হবে।

- আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট এ্যাবাউট ম্যারেজ - থেমে থেমে বলল, পূর্ণ চোখে তাকাল। সেই দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারল না, চোখ নামিয়ে নিলো, অসুস্থ বোধ করছিল সে।

মিস্টার সিকদার তার দিকে ফিরলেন - এনি কোশ্চেন ব্যানার্জ্জি?

- নো স্যার।

- মিস্ সরকার, দ্যাটস্ অল্, ইউ মে গো নাউ। মিস্টার সিকদারের গম্ভীর গলা শুনতে শুনতে আলতো চোখ তুলে সে দেখল অবন্তী চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বুকে ব্যথা। দীর্ঘশ্বাসে বুক খালি করে দিতে দিতে সে বলল - শি ইজ লাষ্ট ক্যান্ডিডেট, এন্ড উই মে গো ফর লাঞ্চ, দিস ইজ ওয়ন পাষ্ট ফিফটিন....

বেয়ারার হাতে ফাইল দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে এলো। লিফ্ট - দেখল লিফ্ট অবন্তীকে নিয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। এত জোরে সে বোতাম টিপল আঙুল ব্যথা করে উঠল। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখল পাঁচ চার তিন দুই এক জি... সে ছটফট করছিল।

নেমে এলো সে। দ্রুত পায়ে ফুটপাথে পা দিয়ে দেখল রাস্তার ওপারে স্টপেজে অবন্তী দাঁড়িয়ে আছে। তৃষ্ণার্তের মতো তাকাল সে, রাস্তায় নামল, আঃ, গাড়ির সার চলছে তো চলছেই, সে অধৈর্য হয়ে উঠল, আর ঠিক তখন অবন্তী তাকে দেখতে পেয়েছিল। দেখে অবন্তী দ্রুত হাঁটছিল, যেন কোনো হরিণী দিশাহারা, পালাতে মাঠে নেমে পড়ল, প্রায় ছুটছিল।

সে ভুলে গেল তার বয়সের কথা, তার পদমর্যাদার কথা, সে যেন নিজের অস্তিত্বকেই ভুলে গিয়েছে, এভাবেই ছুটে এলো অবন্তীর কাছে, দুহাত দুদিকে প্রসারিত করে খুব কাছে এগিয়ে এলো, বলল - এখন যদি তুমি পালাতে চাও আমি কিন্তু লোকলজ্জা মানবো না, তোমাকে দুহাত দিয়ে বুকে তুলে নেবো, আমি আজ খু-উ-ব সাহসী হয়েছি।

সবুজ ঘাসের আশ্রয়ে অবন্তী হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে পড়ল, তার আঁচল বিছিয়ে গেল ঘাসে ঘাসে।

সে বসল পাশে, ডাকল - অবন্তী, এই অবন্তী!

অবন্তী সাড়া দিলো - উঁ!

- ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা আশা নিয়ে এতকাল ধরে আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। সে অপেক্ষা সার্থক তো?

অবন্তী ছোট্ট করে বলল - হুঁ।